প্রস্তাবনা

আমাদের সামনে নিরন্তর প্রসারিত রয়েছে বিশ্বজগৎ। একদিকে মাথার ওপর অনন্ত আকাশ, আপনাকে মেলে ধরে আছে অসংখ্য গ্রহ-নক্ষত্র, চন্দ্র-সূর্য-তারার সমাবেশে। অসীম শূন্যে বিরাজ ক'রে তারা কালে কালান্তরে আবর্তিত হয়ে চলেছে মূক ভাষায়। অন্যদিকে আমাদের এই পৃথিবী - তরুলতা, নদী, সাগর, প্রান্তর বিধৃত মুখর এক জগৎ, তারই অন্যতম বাসিন্দা মানুষ।

জীবনের বিচিত্র পথে চলতে চলতে মানুষ দেখে চলেছে এই মৌন-মুখর বিশ্বজগতকে, দেখছে তার নিজের জীবনকেও। বিশ্বের অণু-পরমাণু থেকে শুরু করে জীবনের সুখ-দুঃখ, ব্যথা-বেদনা, জন্ম-মৃত্যু মনে মনে ছায়া ফেলে যায় মানুষের মনে। তার থেকে জন্ম নেয় জীবনের বিচিত্র অনুভূতি, বিচিত্র ভাবনা। কিন্তু সাধারণ মানুষ তার অনুভূতি ভাবনা সঘৃত ছায়াকে কায়ায় ধরতে পারে না। তা পারেন কবি, তাঁর সৃষ্টির মধ্যে। কবির কাব্য তাই তাঁর জীবনভাবনারই বাঙ্ময় রূপায়ন।

রবীন্দ্রনাথের কাব্যও তাঁর জীবন ভাবনারই প্রকাশ। এবং যেহেতু মূলত তিনি কবি।[১] তাই তাঁর এই জীবনভাবনার প্রকাশ ঘটেছে তাঁর কাব্যকে আশ্রয় ক'রে। একথা বাহ্যত সত্য যে রবীন্দ্রনাথের প্রতিভা বহু বিচিত্র রূপককে আশ্রয় ক'রেছে। কিন্তু এমন অবস্থাতেও কাব্যই হচ্ছে তার আত্মপ্রকাশের মৌল মাধ্যম।

> "His personality is completely revealed in his poems, which are the unconscious expression of his soul, the outpourings of his devotional heart, and the revelation of his poetic consciousness. His writings must and do certain suggestions of his intellectual creed. Though poetry is not philosophy, it is possible for us to

---

১. আত্মপরিচয়/ ৪ সংখ্যক প্রবন্ধ /শতবর্ষ সং (১০ম খন্ড)/ ১৯৬১/ পৃ.২০৫

derive from Rabindranath's works his philosophical views."[2]

তাঁর এই কবিসত্তা এতই প্রবল যে যেকোন অবস্থায় তিনি সত্তাকে বিসর্জন দিয়ে কিছু লিখতে পারেননি। তাই যখন তিনি গান রচনা করেন তখনও তাঁর কবি পরিচয় চাপা থাকে না। গীতাঞ্জলির মতো রচনাকে আমরা তো কাব্য হিসেবেই গণ্য করে এসেছি। গীতবিতান বাহ্যত গানের সংকলনই বটে, কিন্তু অক্লেশে এইসব গান কবিতা হিসেবেও উপভোগ্য। রবীন্দ্রনাথের এই আত্যন্তিক কবিসত্তার সবচেয়ে বড় পরিচয় পাই তাঁর নাটকের মধ্যে। গান তবু অনেকটাই কবিতার কাছাকাছি। কিন্তু নাটক তো তা নয়। অথচ দেখতে পাই - রবীন্দ্রনাথের নাটক প্রকৃতপক্ষে কাব্যময়তায় ভরা। এবং এসব যে ঘটেছে, তার একটাই কারণ - কিছুতেই তিনি তাঁর কবিসত্তাকে বিসর্জন দিয়ে এইসব লিখতে পারেন নি। বস্তুত গভীরতর অর্থে, তাঁর গান ও নাটক তাঁর কবিতারই পরিপূরক। যদি এই হয় যে কাব্যেই তিনি নিজেকে উদ্‌ঘাটন করেছেন, তবে একথাও সত্য যে সেই একই সত্য নিহিত আছে তাঁর গান ও নাটকের মধ্যে অর্থাৎ এগুলিও কবিতার পাশাপাশি তাঁর আত্মপ্রকাশের মাধ্যম হয়ে উঠেছে।[৩]

তাহ'লে দাঁড়াচ্ছে, যাকে আমরা কবি হিসেবে জানি, তাঁর সেই কবিসত্তার উপাদান হল যথাস্থানে কাব্য, গান ও নাটক। তাই কবি রবীন্দ্রনাথকে খুঁজতে গিয়ে কবিতার পাশাপাশি তাঁর গান ও নাটককেও অবলম্বন করতে হবে। এইভাবেই তাঁর যথার্থ কবিসত্তার পরিচয় পাওয়া যাবে। অর্থাৎ কবি হিসেবে যে চোখে তিনি জীবনকে দেখেছেন, জীবনের বিচিত্র অভিজ্ঞতা থেকে ধীরে ধীরে গড়ে উঠেছে তাঁর জীবনভাবনা, সেই একই চোখ দিয়ে সেই একই জীবনভাবনা দিয়ে গড়ে উঠেছে তাঁর গান ও নাটক। বস্তুত, রবীন্দ্রনাথের জীবনভাবনার তিনটি মৌল উপাদান : কাব্য, গান ও নাটক। এরা তাই শুধু যে পরিপূরক বা সম্পূরক তাই নয়, এরা অন্যোন্যও বটে। তাই রবীন্দ্রনাথের জীবনভাবনার স্বরূপ উদ্‌ঘাটনের জন্য শুধুমাত্র কাব্যের দিকে তাকালে চলবে না, একই সঙ্গে গান ও নাটককেও আশ্রয় করতে হবে।

---

2. Dr. S. Radhakrishnan, The Philosophy of Rabindranath Tagore, Good Companions Publishers, Baroda, 1961, p. 4.
৩. Rabindranath Tagore poet and Dramatist/Edward Thompson/ Rddhi-India/1926

এখানে প্রশ্ন তোলা যাক্ - কবির কাজ কী ? কবি ও কাব্য সম্পর্কে প্রাচীনকাল থেকেই তর্কবিতর্কের শেষ নেই। সবাই জানেন, প্লেটো কবিদের নিন্দা করেছেন এই বলে যে তাঁরা দু'দুবার বাস্তবতা থেকে স্নরে যান এবং সেইজন্যেই তাঁরা মিথ্যাবাদী।[৪] অন্যদিকে শেলীর মতো কবি বলেছেন, কবিরা হচ্ছেন "unacknowledged legislator of the world."[৫] এখন কথা হচ্ছে, প্লেটো অথবা শেলী, যিনি যাই বলুন না কেন, কাব্যকে আমরা ভারতীয়রা ব্রহ্মস্বাদের মর্যাদা দিয়েছি এবং একথাও অবিসংবাদী সত্য যে কাব্য সবসময় আমাদের সামনে সত্যের নিরিখ হিসেবে দেখা দিয়ে এসেছে। অর্থাৎ, কাব্যের মধ্যে এমন এক অলিখিত সত্য নিহিত থাকে যা মানুষ জীবনের মূল্যবান ঐশ্বর্য বলে মনে করে। উপনিষদের প্রাচীন ঋষিরা সূর্যের দিকে তাকিয়ে বলেছেন : 'অপাবৃণু সত্যধর্মায় দৃষ্টয়ে'। একথা কি কবিদেরও কথা নয় ? কবিরাও কি সত্যের অনুসন্ধানেই বৃত নন ? আসলে, কবির জীবন ভাবনা প্রকারান্তরে গভীরতর অর্থে সত্যানুসন্ধান এবং সত্যানুসন্ধানের জন্যই তাঁরা সারা জীবন ব্যাপৃত থাকেন।

মানবজীবনের দুই সীমানা, দুই জগৎ। একদিকে রয়েছে প্রসারিত পৃথিবী - যা আমরা চোখে দেখি। গাছপালা, সাগর, নদী, প্রান্তর, পাহাড়-পর্বত। এরই মধ্যে বিধৃত মানুষের জীবন। জন্ম-মৃত্যু, পাপ-পুণ্য, সুখ-দুঃখ, আনন্দ-বেদনা ইত্যাদির সমবায়ে এই যে মানুষের জীবন, তার প্রকাশ পায় পার্থিব জীবনকে আশ্রয় ক'রে। এই হচ্ছে মুখর-জগৎ, যা কথা বলে। অন্যদিকে আছে দূরের বিশ্ব ব্রহ্মান্ড, মাথার ওপর অনন্ত আকাশ, কোটি কোটি গ্রহ-নক্ষত্র, তারা, নীহারিকা। অন্তহীন এই বিশ্ব মৌণ, কথা বলে না। এই দুই জগৎ নিরন্তর প্রসারিত থাকে কবির সামনে। কবিকে এই দুই জগৎই ক্ষণে ক্ষণে ডাক দেয়। তাঁর মনের উপর ছায়া ফেলে যায়। কবি প্রকৃত পক্ষে এই মৌণ-মুখর দুই জগৎকে আশ্রয় করেই বেঁচে থাকেন, তাঁর সমগ্র জীবনভাবনা বিধৃত হয়।

---

৪. Plato o poetics.

৫ . Defence of Poetry.

বলা বাহুল্য, যে জীবন-ভাবনার কথা বলছি তা একদিনে অকস্মাৎ গড়ে না, ওঠার প্রশ্নই ওঠে না। কবি তাঁর জীবনের বিভিন্ন পর্বে বিচিত্র অভিজ্ঞতার ভিতর দিয়ে অগ্রসর হতে হতে ঐ দুই জগতের সমবায়ে গড়ে ওঠা শেষপর্যন্ত ঐ জীবন-ভাবনায় উপনীত হন এবং সেই কারণেই কবির কোন একটি বিশেষ রচনায় তাঁর জীবনভাবনার পরিচয় পাওয়া যাবে না। কেন না, এই জীবনভাবনা প্রকৃতপক্ষে জীবনের অখন্ড ভাবনা, কোন খন্ডিত তাৎক্ষণিক ভাবনা প্রকৃতপক্ষে জীবনের অখন্ড ভাবনা, কোন খন্ডিত তাৎক্ষণিক ভাবনা নয়। তাই, এই জীবনভাবনার স্বরূপ উদ্‌ঘাটনে একদিকে যেমন কবির অনেক রচনার দিকে মনোযোগী হতে হয়, অন্যদিকে তেমনি মনে রাখা দরকার - এই জীবনভাবনার একটা বিবর্তণেরও দিক আছে।

আর এক দৃষ্টিকোণ থেকে বিচার করলে এই জীবনভাবনাকে কি জীবনদর্শনের নামান্তর হিসেবে গণ্য করা চলে ? অথবা, জীবনভাবনা ও জীবনদর্শন কি সমার্থক ? যদি তাই হয়, তাহলে স্বভাবতই মনে করা যেতে পারে - কবির জীবনভাবনা আসলে কবির জীবনদর্শন এবং এমন অবস্থায় কবিকে দার্শনিক হিসেবে গণ্য করা যেতে পারে, যদি চ উভয়ের পথ এক নয়। দার্শনিকের সঙ্গে কবিদের অবশ্য এক জায়গায় মিল আছে গভীরভাবে, তা হলো - উভয়েরই লক্ষ্য এক : সত্যের সন্ধান। সম্ভবত এই কারণেই কবির কাব্যের বিশ্লেষণে জীবনদর্শনের প্রসঙ্গ তোলা হয়। শোপেন হাওয়ার দার্শনিকদের দুটি শ্রেণীতে ভাগ করেছেন : এক যিনি সত্যের সন্ধানে ব্যাপৃত থাকেন, দুই **'False philosopher'**, অর্থাৎ যিনি সত্যের কথা না ভেবে অনর্থক তাত্ত্বিক বিতর্কের মধ্যে নিজেকে জড়িত রাখেন। শোপেনহাওয়ার কথিত এই প্রথম শ্রেণীর দার্শনিকরাই প্রকৃত অর্থে দার্শনিক এবং তাঁদের সৃষ্ট দর্শনই সত্যের সন্ধান। এদিক থেকে, কবির জীবনভাবনা ও দার্শনিকের দার্শনিকতত্ত্বের মধ্যে বস্তুত বেশ একটা মিল খুঁজে পাই। একজন দার্শনিক যেমন সত্যের পথ দেখান, একজন কবিও তেমনি তাঁর জীবনভাবনার ভিতর দিয়ে জীবনের সত্যরূপটি তুলে ধরেন। একজন দার্শনিক যেমন নিরন্তর অনলস সাধনার ভিতর দিয়ে সত্যানুভবে উত্তীর্ণ হন। একজন কবিকেও

তো তেমনি নিরলস জীবনচর্যার ভিতর দিয়ে অনুরূপ সত্যে উপনীত হতে হয়। বস্তুত, জীবনভাবনা হচ্ছে কবি জীবনের সেই নির্যাস যা গভীর গভীরতর জীবনরোমন্থনের মধ্য দিয়ে লব্ধ হয়। বলা বাহুল্য, একথা সেইসব কবিদের সম্পর্কে প্রযোজ্য যাঁরা তাঁদের দীর্ঘ জীবন যাপনের সূত্রে বহু বিচিত্র সৃষ্টির অধিকারী।

জীবনভাবনার ধারণাটি ব্যাখ্যা করতে গিয়ে যেকথা বলা হ'ল, আমরা দেখতে পাই - সেকথা রবীন্দ্রনাথ ও তাঁর সৃষ্টি প্রসঙ্গেঁ প্রযোজ্য। রবীন্দ্রনাথ তাঁর সুদীর্ঘ জীবনে যা দেখেন, যা পেয়েছেন, তাঁর সত্যিই তুলনা নেই। সেই অতুলনীয় জীবনের বিভিন্ন পর্বে তিনি মানবজীবনের বিচিত্র রূপ পর্যবেক্ষন করে তার ভিতর থেকে গড়ে তুলেছেন তাঁর কাব্য, গান, নাটক এবং এইসব সৃষ্টির ভিতর দিয়েই রূপায়িত হয়েছে, বিধৃত হয়েছে তাঁর জীবনভাবনা।

এ বিষয়ে প্রথমেই তাঁর নিজের কথা স্মরণ করা যাক :

" আমার সুদীর্ঘকালের কবিতা লেখার ধারাটাকে পশ্চাৎ ফিরিয়া যখন দেখি তখন ইহা স্পষ্ট দেখিতে পাই - এ একটা ব্যাপার, যাহার উপরে আমার কোনো কর্তৃত্ব ছিল না। যখন লিখিতেছিলাম তখন মনে করিয়াছি, আমিই লিখিতেছি বটে, কিন্তু আজ জানি কথাটা সত্য নহে। কারণ সেই খন্ড কবিতাগুলিতে আমার সমগ্র কাব্যগ্রন্থের তাৎপর্য সম্পূর্ণ হয় নাই - সেই তাৎপর্যটি কী তাহাও আমি পূর্বে জানিতাম না। এইরূপে পরিণাম না জানিয়া আমি একটির সহিত একটি কবিতা যোজনা করিয়া আসিয়াছি - তাহাদের প্রত্যেকের যে ক্ষুদ্র অর্থ কল্পনা করিয়াছিলাম, আজ সমগ্রের সাহায্যে নিশ্চয় বুঝিয়াছি, সে অর্থ অতিক্রম করিয়া একটি অবিচ্ছিন্ন তাৎপর্য তাহাদের প্রত্যেকের মধ্য দিয়া প্রবাহিত হইয়া আসিয়াছিল।" [৬]

একথা বলার পরেই পুনরায় বললেন,

---

৬. আত্মপরিচয় /১ সংখ্যক প্রবন্ধ রবীন্দ্ররচনাবলী প:ব: সংকলন ১৩৬৮ শতবর্ষ সং/ পৃ.১৬৭.

"বিশ্ববিধির একটা নিয়ম এই দেখিতেছি যে, যেটা আসন্ন, যেটা উপস্থিত, তাহাকে সে খর্ব করিতে দেয় না। তাহাকে এ কথা জানিতে দেয় না যে, সে একটা সোপান পরম্পরার অঙ্গ। তাহাকে বুঝাইয়া দেয়, সে আপনাতে আপনি পর্যাপ্ত। ফুল যখন ফুটিয়া ওঠে তখন মনে হয়, ফুলই যেন গাছের একমাত্র লক্ষ্য - এমনি তাহার সৌন্দর্য, এমনি তাহার সুগন্ধ যে মনে হয় যেন সে বনলক্ষ্মীর সাধনার চরমধন। কিন্তু সে যে ফল ফলাইবার উপলক্ষ্যমাত্র সে কথা গোপনে থাকে। বর্তমানের গৌরবেই সে প্রফুল্ল, ভবিষ্যৎ তাহাকে অভিভূত করিয়া দেয় না। আবার ফলকে দেখিলে মনে হয়, সেই যেন সফলতার চূড়ান্ত, কিন্তু ভাবী তরুর জন্য সে যে বীজকে গর্ভের মধ্যে পরিণত করিয়া তুলিতেছে, একথা অন্তরালেই থাকিয়া যায়। এমনি করিয়া প্রকৃতি ফুলের মধ্যে ফুলের চরমতা, ফলের মধ্যে ফলের চরমতা রক্ষা করিয়াও তাহাদের অতীত একটি পরিণামকে অলক্ষ্যে অগ্রসর করিয়া দিতেছে।

কাব্যরচনা সম্বন্ধেও সেই বিশ্ববিধানই দেখিতে পাই - অন্তত আমার নিজের মধ্যে তাহা উপলব্ধি করিয়াছি। যখন যেটা লিখিতেছিলাম তখন সেইটেকেই পরিণাম বলিয়া মনে করিয়াছিলাম। এইজন্যে সেইটুকু সমাধা করার কাজেই অনেক যত্ন ও অনেক আনন্দ আকর্ষন করিয়াছে। আমিই যে তাহা লিখিতেছি এবং একটা-কোনো বিশেষ ভাব অবলম্বন করিয়া লিখিতেছি, এ সম্বন্ধেও সন্দেহ ঘটে নাই। কিন্তু আজ জানিয়াছি, যে-সকল লেখা উপলক্ষ মাত্র - তাহারা যে অনাগতকে গড়িয়া তুলিতেছে সেই অনাগতকে তাহারা চেনেও না।" [৭]

এইভাবেই কবি তাঁর নিজের কাব্যরচনার ইতিহাস বিবৃত করেছেন। লক্ষ্য করা দরকার, কবির এই দুটি উক্তি আসলে তাঁর কাব্যসৃষ্টির অর্ন্তনিহিত রহস্যের পরিচয় বহন করছে। কিন্তু, তাঁর এই সৃষ্টির একটি বাহ্যিক বা বস্তুগত দিকও আছে। যার ভেতর দিয়ে তাঁর সৃষ্টির মৌল প্রকৃতিটি ধরা পড়েছে। এই প্রসঙ্গে কবির নিম্নোক্ত উক্তিটি স্মরণযোগ্য :

---

৭. আত্মপরিচয়, /পৃষ্ঠা সংখ্যা - ১৬৭ - ১৬৮/

" এই লেখাগুলি যেমনি হোক এর পিছনে একটি ভূমিকা আছে - সে হচ্ছে একটি বালক, সে কুনো, সে একলা, সে একঘরে, তার খেলা নিজের মনে, সে ছিল সমাজের শাসনের অতীত, স্কুলের শাসনের বাইরে। বাড়ির শাসনও তার হালকা। পিতৃদেব ছিলেন হিমালয়ে, বাড়িতে দাদারা ছিলেন কর্তৃপক্ষ। জ্যোতিদাদা, যাঁকে আমি সকলের চেয়ে মানতুম, বাইরে থেকে তিনি আমাকে কোনো বাঁধন পরান নি। তাঁর সঙ্গে তর্ক করেছি, নানা বিষয়ে আলোচনা করেছি বয়স্যের মতো। তিনি বালককেও শ্রদ্ধা করতে জানতেন। আমার আপন মনের স্বাধীনতার দ্বারাই তিনি আমার চিত্তবিকাশের সহায়তা করেছেন। তিনি আমার 'পরে কর্তৃত্ব করবার ঔৎসুক্যে যদি দৌরাত্ম্য করতেন তাহলে ভেঙেচুরে তেড়েবেঁকে যা-হয় একটা কিছু হতুম, সেটা হয়তো ভদ্রসমাজের সন্তোষজনকও হত, কিন্তু আমার মতো একেবারেই হত না।" [৮]

কবির এই আত্মজবানীর দিকে লক্ষ্য রাখলে দেখা যায় যে কবি যখন পিছন ফিরে তাঁর অতীতের দিকে তাকিয়ে তাঁর কাব্যসৃষ্টির অন্তর্নিহিত তাৎপর্য বিশ্লেষণ করতে উদ্যত হয়েছেন তাঁর সামনে তাঁর সমগ্র রচনার ছবিটি উদ্ভাসিত ছিল। তাঁর কথা থেকেই বোঝা যায় - কবি তাঁর সৃষ্টির মধ্যে একটা বিশেষ তাৎপর্য লক্ষ্য করেছেন যা তাঁর অন্তর্জীবনের সত্যরূপ। অর্থাৎ কবি যেন বিশেষ একটা লক্ষ্যে পৌঁছোবার জন্য ক্রমাগত লিখে গেছেন এবং জীবনের অনেকটা পথ পরিক্রমা করবার পর অবশেষে লক্ষ্য করেছেন যে তাঁর সৃষ্টির ভিতর দিয়ে তিনি তাঁর একটি বিশেষ বক্তব্যকে তুলে ধরেছেন। বলাবাহুল্য, তাঁর এই বক্তব্য আসলে তাঁর জীবন ভাবনা, জীবনসম্পর্কে তাঁর ভাবনা।

বস্তুত, কবির এই জীবনভাবনার একটি বিস্তৃত প্রেক্ষাপট আছে। একটি বিশাল পট-ভূমি বিস্তৃত যার ওপর তাঁর জীবন যেমন দাঁড়িয়ে আছে, তেমনি দাঁড়িয়ে আছে তাঁর সৃষ্টি। তাঁর জীবন থেকেই তো তাঁর সৃষ্টির উদ্ভব এবং জীবনের নানা অবস্থা থেকে নুড়ি, পাথরের সঞ্চয়ে গড়ে উঠেছে জীবন সম্পর্কে তাঁর ভাবনা। এ বিষয়ে কবি নিজেই তাঁর নানা রচনায়

---

৮. তদ্দেব, / ৫ সংখ্যক প্রবন্ধ / পৃ.২০৯ /

আলোচনা করেছেন। তার ভিতর দিয়ে তাঁর রচনার উৎস ও লক্ষ্য সম্পর্কে অবহিত হওয়া যায়। তাছাড়া তাঁর সৃষ্টি ও সাহিত্য সম্পর্কে নানা জনে নানান আলোচনা করেছেন। সেই সব লেখার ভেতর দিয়েও কবির সৃষ্টির স্বরূপ ধরা পড়েছে। এখানে প্রাসঙ্গিক কয়েকটি মন্তব্য উদ্ধৃত হল :

ক) "আত্মপ্রকাশের নানা ক্ষেত্রে বাবার অবিসংবাদী প্রতিভা সম্বন্ধে আমার কিছু বলতে যাওয়া ধৃষ্টতা। আমার চাইতে যোগ্যতর অনেক ব্যক্তি এ বিষয়ে আলোচনা করেছেন, এবং ভবিষ্যতে আরো অনেকে হয়তো করবেন। বাবা তাঁর নিজের স্মৃতিকথা কিছু কিছু বলেছেন। একটা বিষয় লক্ষণীয়, বাবা তাঁর জীবনস্মৃতিতে সাল-তারিখের বা ঘটনার অনুবর্তন করতে যাননি, যা বলতে চেয়েছেন সে হল তাঁর অন্তর্জীবনের উন্মোচন। সে ক্ষেত্রে মনের সূক্ষ্মাতিসূক্ষ্ম ভাবের প্রকাশই মুখ্য, যেখানে জীবনের মোটা মোটা ঘটনাবলী অনুধাবন করতে যাওয়া বিড়ম্বনা মাত্র। সাধারণ মানুষের জীবন দৈনন্দিন ঘটনাচক্রে বাঁধা, কিন্তু অসাধারণ প্রতিভাসম্পন্ন ব্যক্তি প্রতিদিন দৈনন্দিনের চৌহদ্দি অতিক্রম করতে থাকেন। প্রতিভার জগতকে সব সময় বাস্তব জগতের নিয়মের অন্তর্ভুক্ত করা সম্ভবপর হয় না। সকল সৃজনধর্মী প্রতিভার বেলায়ই হয়তো একথা সত্য - কিন্তু বাবার বেলায় এ কথা যেন বিশেষভাবে সত্য। তাঁর প্রতিভা ছিল বহু বিচিত্র। তিনি ছিলেন একাধারে কবি, বিজ্ঞানী এবং দার্শনিক ঋষি। এই ধরণের বহুমুখী প্রতিভাকে সম্যক বিশ্লেষণ করার যত চেষ্টাই হোক্ না কেন, তাঁর ব্যক্তি-স্বরূপের সবটুকু রহস্য আয়ত্ত করা যায় না, কারণ সচরাচর আমরা মানুষকে বিচার করার জন্য যে মাপকাঠি ব্যবহার করে থাকি, এ ক্ষেত্রে তা অচল।" ১

খ) " কোনো জীবনীই তাঁর জীবনের পূর্ণ পরিচয় দিতে পারবে বলে তো মনে হয় না, কারণ তাঁর ব্যক্তিত্ব ছিল যেমনি বিরাট তেমনি জটিল। অন্যদিকে আবার গানের সুরে মীড়, বীনার তারে যেমন ঝংকার, তেমনি মধুর ছিল তাঁর জীবনের ব্যঞ্জনা।

---

১. পিতৃস্মৃতি / রথীন্দ্রনাথ ঠাকুর / জিজ্ঞাসা / ১৩ অগ্রহায়ণ ১৩৭৩ (1966) / বাবাকে যেমন দেখেছি / পৃ. ২১৮ /

সমানধর্ম্মা ও সমানুভূতিবিশিষ্ট কেউ যদি কখনো কলম ধরেন, তাহলে হয়তো তাঁর বিষয়ে কিছু বলতে পারবেন। বস্তুত তাঁর নিজের রচনাই তাঁর জীবনের প্রকৃষ্ট ভাষ্য, সেখানেই তিনি সত্যি সত্যি আত্মপ্রকাশ করে গেছেন।" ১০

গ) "রবীন্দ্রবাবুর জীবনে এবং কাব্যে এত বিচিত্র ভাবের সমাবেশ আছে যে তাহার নানান মহালয় প্রবেশ দ্বারের চাবি সকল সময়ে খুঁজিয়া পাওয়া যায় না।

আমাদের দেশে জন্মগ্রহণ করিয়া বিচিত্রতার স্বাদের জন্য কবির চিত্তে এমন সুগভীর আকাংক্ষা কী করিয়া জাগিল, তাহা আমার কাছে বিস্ময়কর। আমাদের দেশের সমাজের জীবন নানা কারণে অত্যন্ত ক্ষুদ্র - কৃত্রিম লোকাচারের বন্ধন তো আছেই - কিন্তু ক্ষুদ্রতার আসল কারণ এ দেশে কর্মক্ষেত্র নিতান্ত সংকীর্ণ, সেইটুকুর মধ্যে মানুষের বিচিত্র শক্তিকে ভালো করিয়া ছাড়া দেওয়া যায় না, তাহাতে আমাদের জীবনের লীলা ব্যাঘাত পায় বলিয়া আনন্দের অভাব ঘটে। শুধু তাই নয়। আমাদের হৃদয়ের ভাব বাহিরের ক্ষেত্রে নানারূপে আপনাকে সৃষ্টি করিতে চায়, সেই সৃষ্টি করিতে গিয়াই সে যথার্থ পরিণতি লাভ করে, সে বল পায়, তাহার বাড়াবাড়ি সমস্ত কাটিয়া যায়, সে আপনার ঠিক ওজনটি রক্ষা করিতে শেখে - এককথায় সে রীতিমত পাকা হইয়া উঠে। কিন্তু যে সমাজে মানুষের চিত্ত বাহিরে আপনাকে প্রকাশ করিবার এমন প্রশস্ত স্থান ও বিচিত্র অধিকার না পায়, সে সমাজে ভাবুকতা আপনার পরিমাণ হারাইয়া ফেলে, হয় সে অত্যন্ত ক্ষুদ্র হইয়া পঙ্গু হইয়া নিতান্ত গ্রাম্য হইয়া থাকে, নয় সে আপনাকে অসংগতরূপে স্ফীত করিয়া অদ্ভুত-প্রমত্ততার মধ্যে ছুটিয়া যায়। যেখানে জীবনের ক্ষেত্র দূরবিস্তৃত সেখানে মানুষের কল্পনা নিয়তই সত্যের সংস্রবে আপনাকে সুবিদিত আকার দান করিতে পারে - যতদূর পর্যন্ত তাহার শক্তির অধিকার ততদূর পর্যন্ত সে ব্যাপ্ত হয় এবং কোন্‌খানে তাহার সীমা তাহাও আবিষ্কার করিতে তাহার বিলম্ব ঘটেনা।" ১১

---

১০. পিতৃস্মৃতি / পৃ. স.২৩৫

১১. রবীন্দ্রনাথ / অজিত চক্রবর্তী / বিশ্বভারতী গ্রন্থালয় / আশ্বিন ১৩৫৩ / পৃ.স. ১১ - ১২

ঘ) "বিশ্বকে মানুষের জীবনকে নানা দিক দিয়া উপলব্ধি করিবার এই ব্যাকুলতাই কবি রবীন্দ্রনাথের কবিত্বকে উৎসারিত করিয়াছে ইহাই আমাদের বিশ্বাস। আপনার জীবনের দ্বারা সম্পূর্ণরূপে যে জীবনকে পাওয়া যাইতেছে না অথচ দূর হইতে যাহার পরিচয় পাইতেছি, নিজের অন্তরের ঔৎসুক্যের তীব্র আলোকে তাহা দীপ্যমান হইয়া দেখা দেয়। কবির ব্যাকুল কল্পনার শতধা বিচ্ছুরিত নানাবর্ণময় রশ্মিচ্ছটায় প্রদীপ্ত জগদ্দৃশ্যই আমরা তাঁহার কাব্যের মধ্যে দেখিতে পাই। এক দিক হইতে যে অবস্থাকে প্রতিকূল বলিয়াই মনে করা যাইত, কবিত্বের পক্ষে তাহাও অনুকূল হইয়াছে। কাপড়ের আবরণের মধ্যে খাঁচার পাখির গান আরো বেশী করিয়া স্ফূর্তি পায় তাহা দেখা গিয়াছে, এ ক্ষেত্রেও বিশ্বের সঙ্গে আমাদের সম্পূর্ণভাবে যোগের অভাবই আমাদের কবির বিশ্ববোধকে এমন অসামান্য ভাবে তীব্র করিয়া তাহাকে নানা ছন্দের অশ্রান্ত সংগীতে উৎসারিত করিয়া দিয়াছে"।[১২]

ঙ) "রবীন্দ্রনাথের জীবনী সম্বন্ধে এই একটি কথা মনে রাখিতে হইবে যে, তিনি বরাবর নিজের স্বভাবের অন্তর্নিহিত পথ অনুসরণ করিয়া চলিয়াছেন, সেই তাঁহার স্বভাবের মধ্যেই তাঁহার কবি প্রকৃতি, তপস্বী প্রকৃতি, ত্যাগী প্রকৃতি, ভোগীপ্রকৃতি পরস্পর ঠেলা-ঠেলি করিতে করিতে ক্রমশই পরস্পরের মধ্যে সামঞ্জস্য করিয়া লইতেছে। সেই প্রকৃতিটির মধ্যে অনুভূতি যতই তীব্র হউক, ভোগ প্রবৃত্তি যতই প্রবল হউক, তাঁহারই মধ্যে কোনো বিশেষ একটি দিকে সমস্ত প্রকৃতিকে আবদ্ধ করিবার বিরুদ্ধে ভিতর হইতে বরাবর একটা ঠেলা ছিল। সেইজন্য নদীর বাঁকের মতো ক্রমাগত একটা হইতে অন্যটায়, এক রস হইতে অন্য রসে তাঁহার স্বভাব আপনার সার্থকতাকে খুঁজিয়া বেড়াইয়াছে এবং অবশেষে ধর্মের মধ্যে আপনার সমস্ত দ্বন্দ্ব ও বিরোধের সামঞ্জস্য লাভ করিয়াছে বলিয়া আপনারই ভিতর হইতে ভারতবর্ষের চিরন্তন সমন্বয়াদর্শকে সে আবিষ্কার করিয়াছে।"[১৩]

---

১২. রবীন্দ্রনাথ / অজিত চক্রবর্তী / পৃ.স.১৩

১৩. তদেব - পৃ.স: ১৫

চ) " আমি তো মনে করি কবির কাব্যরচনা ও জীবনরচনা একই রচনার অন্তর্গত, জীবনটাই কাব্যে আপনাকে সৃষ্টি করিয়া চলিয়াছে। সেই জন্য জীবনের ভিতর হইতে কাব্যকে যদি দেখি, অথবা কাব্যের ভিতর হইতে যদি জীবনকে দেখি, তাহাতে কবিতার ব্যক্তিগত দিকটার উপরেই বেশি ঝোঁক দেওয়া হইবে না। কারণ কবিতা জিনিষটাই ব্যক্তিগত নহে, এবং কবির যথার্থ জীবনও তাঁহার আপনার একলার জিনিষ নহে। তিনি যেন সচ্ছিদ্র বংশখণ্ডের মতো, অন্য জিনিসে যে ছিদ্র কাজের পক্ষে ব্যাঘ্যাতকর হয়, বংশখণ্ডে সেই ছিদ্রই বিশ্বসংগীত প্রচার করিয়া থাকে।" [১৪]

এই উদ্ধৃতিগুলির ভিতর দিয়ে রবীন্দ্রনাথের জীবন ও তাঁর সৃষ্টির তাৎপর্য অনেকটা বোঝা যাবে। একই ভাবে, অন্যের চোখে রবীন্দ্রনাথের জীবন ও তাঁর রচনার সত্যরূপটি কীভাবে ধরা পড়েছে। তার কিছু দৃষ্টান্ত তুলে ধরা গেল :

ক) " রবীন্দ্রনাথ ও আমি যখন সর্বপ্রথম সৌহার্দ্যের সুনিবিড় বন্ধনে পরস্পর আকৃষ্ট হই তাহার পর প্রায় সুদীর্ঘ পঁয়ত্রিশ বৎসরকাল কাটিয়া গেল। জীবনের বহু বিচিত্র বিকাশ ও ধারার পরিচয় লাভের পথে একদা আমি যখন তিলে তিলে অগ্রসর হইতেছিলাম সেই ক্লান্তিহীন প্রয়াসে বৎসরের পর বৎসর তিনি আমাকে প্রতিদিন সখ্য ও সাহার্য্য দান করিয়াছেন। সহস্র সহস্র বৎসরের মৌণতা ভাঙিঁয়া বাণীহীণ তরুলতা অবশেষে একদিন যেন কথা কহিয়া উঠিল, আপন অন্তরজীবন সুখ-দুঃখ পত্তন-অভ্যুদয়ের কাহিনী যে আপনি লিপিবদ্ধ করিয়া চলিল। এই সুরচিত ইতিহাসের দ্বারা ইহাই প্রমাণিত হইল যে, উদ্ভিদ্ হইতে আরম্ভ করিয়া উচ্চতম প্রাণী পর্যন্ত নিখিল জীবলোকে একই প্রাণস্পন্দন অনুভূত হইতেছে, একই প্রাণধারা সর্বত্রই বহমান। যে বাধা একদিন আত্মীয় হইতে আত্মীয়কে বিচ্ছিন্ন করিয়া রাখিয়াছিল তাহা দূর হইল, উদ্ভিদ্ ও প্রাণী একই জীবন ধারার বহুমুখী বিকাশ বলিয়া প্রতিপন্ন হইল। এই মহাসত্যকে জানিতে পারিলে জগদ্ব্যাপারে পরমরহস্যের যবনিকা

---

১৪. তদেব, পৃ.স. ১৬ - ১৭

ঘুচাইয়া যাইবে না, বরং গভীরতর নিবিড়তর হইয়াই উঠিবে। মানুষ যে তাহার অসমাপ্ত জ্ঞান, অসম্পূর্ণ দৃষ্টি ও অক্ষম শক্তি লইয়াও অর্বাচীন দিক মহাসমুদ্রে দুঃসাহসিক জয়যাত্রায় আপনার চিত্ততরণী ভাসাইয়া দিল একি কম আশ্চর্য্যের কথা ? যে অবর্ণনীয় রহস্য তাহার দৃষ্টির অগোচর ছিল, এই অভিযান পথে অকস্মাৎ এক একদিন সে রহস্য মুহূর্তকালের জন্য তাহার গোচরীভূত হইতে থাকে এবং যে আত্মসর্ব্বস্বতা এতকাল তাহাকে বিশ্বব্যাপী প্রাণস্পন্দনের প্রতি বিমুখচিত্ত করিয়া রাখিয়া ছিল তাহা তাহার মন হইতে মুহূর্তকালের মধ্যে নিঃশেষে মিলাইয়া যায়।" ১৫

খ) "তিনি আমাদের শ্রেষ্ট কবি ও গদ্যলেখক। জগতের শ্রেষ্ঠ লেখকদিগের মধ্যেও তিনি স্থান পাইয়াছেন। তিনি বাংলা সাহিত্যের প্রায় সকল বিভাগেই হাত দিয়াছেন, এবং যাহাতে হাত দিয়াছেন তাহাকেই অলংকৃত করিয়াছেন এবং তাহাতে নূতন প্রাণের সঞ্চার করিয়াছেন - তাহাই তাঁহার অসামান্য প্রতিভার আলোকে উজ্জ্বল হইয়া উঠিয়াছে। তিনি বিশ্বসংগীত শুনিয়াছেন, তাঁহার কবিতায় ও গদ্যরচনায় আমরা তাহারই প্রতিধ্বনি শুনিতে পাই। সময়গোচর রূপের জগৎ, সৌন্দর্য্যের জগৎ তিনি দেখিয়াছেন ও দেখাইয়াছেন। অধিকন্তু তিনি ধ্বনির জগতের রূপে অনুভব করিয়া অন্যকেও তাহা অনুভব করাইবার অসামান্য শক্তি প্রদর্শন করিয়াছেন। জন্ম-লব্ধ প্রতিভা, শিক্ষা, সাধনা, শোক তাঁহাকে বিশ্বনাথের বাণী শুনিতে সমর্থ করিয়াছে। তিনি পরব্রহ্মের প্রেরণায় তাঁহার রচনার মধ্য দিয়া আমাদিগকে বিশ্বনিয়মের ও বিশ্বনিয়ন্তার সহিত যোগস্থাপন করিতে আহ্বান করিয়া আসিতেছেন।" ১৬

গ) " বাংলা সাহিত্য বলিতে আমি আধুনিক বাংলা সাহিত্য বুঝিব। যে সাহিত্যের সঙ্গে আমাদের সম্পর্ক অতিশয় ঘনিষ্ঠ, যার রূপে ও রসে আমরা, একালের বাঙালী, আমাদের প্রাণের ক্ষুধা মিটাইবার অবকাশ পাইয়াছি, সেই বহু-প্রাচীন-নির্ম্মোক-মুক্ত-

---

১৫. জয়ন্তী উৎসর্গ, / রবীন্দ্র পরিচয়সভা, / ১১ পৌষ, ১৩৩৪, / জয়ন্তী, / শ্রী জগদীশচন্দ্র বসু / পৃ.স.১-২

১৬. জয়ন্তী উৎসর্গ, / রবীন্দ্রনাথ, / শ্রীরামানন্দ চট্টোপাধ্যায়, / পৃ.স. ৯

অভিনব কলেবর-সমৃদ্ধ নূতন আত্মতুষ্টি মূলক সাহিত্যের কথা চিন্তা করিয়া, আমি সেই সাহিত্যে রবীন্দ্রনাথের প্রভাব সম্বন্ধে কিছু আলোচনা করিব। রবীন্দ্র-প্রতিভার পরিমাণ করা আমার কাজ নয়, আধুনিক বাংলা সাহিত্যে সেই প্রতিভার প্রভাব আমি যেমন বুঝিয়াছি, তাহাই নিবেদন করিতে অগ্রসর হইয়াছি মাত্র। তথাপি ইহাও জানিযে, বাংলা সাহিত্যে ও বাঙালীর শিক্ষা-দীক্ষায় এ প্রভাব এখনই সমাপ্ত হয় নাই, এ জাতি যদি বাঁচিয়া থাকে, তবে তাহার জাতীয় ভাব-পুষ্টির ইতিহাসে রবীন্দ্রনাথ নামক অধ্যায় চিরকালের জন্য সন্নিবিষ্ট হইয়া গেছে, এবং সে প্রভাব কোন্ দিকে কতখানি কল্যাণপ্রদ হইবে, ভবিষ্যৎ তাহা ভাল রূপেই নির্ণয় করিবে।" [১৭]

ঘ) "এমন অনেক শিল্পীর কথা আমরা জানি যাঁদের হাতের ছোঁয়া লেগে পাষাণ হয়েছে অহল্যার মতো শাপমুক্তা সুন্দরী, কিন্তু যাঁদের নিজেদের জীবনের বেলায় তাঁদের শিল্পীত্ব খাটেনি। সে-ক্ষেত্রে তাঁরা অবস্থার দাস এবং তাঁদের জীবনের আদর্শও দুর্বল। অথচ শিল্পী নন্ এমন কোনো কোনো মানুষের জীবন এক একখানি শিল্পী সৃষ্টির মতো সযত্নরচিত, সুসঙ্গত, অবান্তরতাবিহীন।

রবীন্দ্রনাথের কৃতিত্ব এইখানে যে, তিনি তাঁর অপরাপর কাব্যের মতো ক'রে তাঁর জীবনকালকেও ছন্দে মিলে উপমায় ব্যঞ্জনায় কল্পনার প্রসারে ও অনুভূতির গভীরতায় একখানি গীতিকাব্যের ঐক্য দিয়েছেন। সেটি বেশ একটি গোটা জিনিষ হয়েছে, ভাঙাঁ ভাঙাঁ বা অসম্বন্ধ হয় নি, অন্তর্বিরোধ সম্পন্ন বা অসঙ্গতিবহুল হয়নি। প্রকৃতপক্ষে, রবীন্দ্রনাথের শ্রেষ্ঠ কীর্ত্তি তাঁর জীবন। তাঁর অন্যান্য কীর্ত্তি বিস্মৃত হবার পরও তাঁর কীর্ত্তিটি জীবিত মানুষের আন্তরিকতম যে জিজ্ঞাসা - "কেমন ভাবে বাঁচব ?" সেই জিজ্ঞাসার একটি সত্য ও নিঃশব্দ উত্তর হয়ে চির-স্মরণীয় হবে।" [১৮]

---

১৭. জয়ন্তী উৎসর্গ, / রবীন্দ্রনাথ ও বাংলা সাহিত্য, / শ্রী মোহিতলাল মজুমদার, / পৃ.স.১০২

১৮. জয়ন্তী উৎসর্গ, / জীবনশিল্পী রবীন্দ্রনাথ, / শ্রী অন্নদাশংকর রায়, / পৃ.স.২৬০

ঙ) "আমাদের দেশের দার্শনিকদের ধারণা ছিল যে, সত্য স্থির। শংকরাচার্য সত্যের লক্ষণ নির্দেশ করে গেছেন - "কাল ত্রয়াবাধিতম্ সত্যম্" - যা ভূত, ভবিষ্যৎ ও বর্তমান এই ত্রিকালে সমভাবে অবাধে অবস্থিতি করে, যার কস্মিনকালেও কোন পরিবর্তন হয় না, তাই সত্য। কিন্তু বর্তমান যুগের ইয়ুরোপীয় দর্শনের বাণী হচ্ছে যে, সত্য গতিতে, সত্য স্থিতিতে নয়, যার গতি নেই, স্ফূর্তি নেই, তা জড়, তা কখনো সত্য হ'তে পারে না। যার জীবনী শক্তি আছে যে আর সকল জিনিষকে নিজের ক'রে নিয়ে তবে নিজেকে প্রকাশ করে, তার অস্তিত্ব সমগ্রের মধ্যে, খণ্ডভাবে দেখ্‌লে তার পরিচয় পাওয়া যায় না। কাল অবিভাজ্য, কাল অনন্ত-প্রবাহ, মহাকালের মধ্যে ভূত, ভবিষ্যৎ, বর্ত্তমান, কিন্তু তা "আজি হ'তে শতবর্ষ পরে" "দূর ভাবী শতাব্দীর" লোকদের কাছে ভূত হ'য়ে যাবে। এই অনন্তকাল দেশ ব্যেপে নিজেকে প্রসারিত ক'রে নেওয়ার 'ইচ্ছাই' রবীন্দ্রকাব্যের একটি প্রধান সুর।"[১৯]

চ) [২০]" কবি রবীন্দ্রনাথ নয়, মানুষ রবীন্দ্রনাথকে আজ আমরা একটু দেখিতে চাই। কবির ইহাতে কিছু আপত্তি হইতে পারে - তিনি হয়ত বলিবেন, তাঁহাকে সত্যভাবে দেখিতে হইলে কবি হিসাবেই দেখিতে হইবে, মানুষ হিসাবে তিনি করিয়াছেন বা না করিয়াছেন সেটা তাহার জীবনে অবান্তর কথা, তাঁহার যে সত্য যে স্বরূপ, তাঁহার মধ্যে শাশ্বত ও সনাতন যদি কিছু থাকে, তাহা তিনি ধরিয়া দিয়াছেন তাঁহার কাব্যে, বাকি যাহা তাহার কোন বিশেষ অর্থ নাই মর্য্যাদাও নাই - অন্যান্য অনেকের সহিত - সেদিক দিয়া তাঁহার খুব বেশী পার্থক্য বা বিশেষত্ব না থাকিলেও থাকিতে পারে। কবির শ্রেষ্ঠ পরিচয় তাঁহার কাব্যে, অন্য পরিচয়ে তাঁহাকে ভুল বুঝা হয়, তাঁহাকে খাটো করা হয়।

কিন্তু মানুষ রবীন্দ্রনাথ বলিতে আমরা একান্ত বাহিরের বৈষয়িক বা সাংসারিক রবীন্দ্রনাথকে বুঝিতেছি না, আমরা তাঁহার ভিতরের সেই সত্যকার মানুষটিরই কথা বলিতেছি, যাহার একটা প্রকাশ হইতেছে - কবি রবীন্দ্রনাথ।

---

১৯. জয়ন্তী উৎসর্গ, / রবীন্দ্রকাব্যের একটি প্রধানসুর, / শ্রী চারু বন্দ্যোপাধ্যায়, / পৃ.স.৩৪৩-৩৪৪
২০. শিল্পী রবীন্দ্রনাথ / নলিনীকান্ত গুপ্ত / রবীন্দ্রনাথ / ১৩৪[illegible] / পৃ: সং — ৩ / [illegible] /

কাব্যেই হয়তো সেই মানুষটির সর্বশ্রেষ্ঠ অথবা সর্বাপেক্ষা পরিস্ফুট প্রকাশ হইয়াছে, তবুও সেই প্রকাশ যে সত্যকে যে উপলব্ধিকে, অন্তরাত্মার যে সিদ্ধিকে ব্যক্ত করিতে, আকার দিতে চাহিতেছে তাহাই আমাদের লক্ষ্য।" ২০

ছ) "রবীন্দ্রনাথ যে একটা বিপুল উত্তুঙ্গ তরঙ্গ আনিয়া দিয়াছেন, আমরা তাহাতে ভাসিয়াছি চলিয়াছি, কিন্তু ঢেউ-এর মাথায় স্থান পাইয়াছি-বলিয়া, অনেক সময়ে বুঝিতেই পারি না আমরা কতদূর উঠিয়াছি, আবার অনেক সময় ঢেউ-এর কথা ভুলিয়া গিয়া মনে করি এই উন্নয়ন আমাদের ব্যক্তিগত কৃতিত্ব। সাবালক সমৃদ্ধ ভাষার একটাই লক্ষণ এই যে, তাহাতে যে কেহ কিছু রচনা করিতে চেষ্টা করে সে হাতের মধ্যে পায় একটা তৈয়ারী যন্ত্র - যন্ত্র তাহাকে গড়িবার জন্যে চেষ্টা করিতে হয় না, তাহার পক্ষে প্রয়োজন কেবল যন্ত্রকে খেলাইবার কৌশল। যে সাহিত্যের জগতে কোন শিল্পীই একটা বিশেষ ধাপের, সুর-গ্রামের নীচে নামিয়া পড়িতে পারেন না - ভাষার সাহিত্যের এমন একটা শক্তি-সামর্থ্য, এমন কারুগত ধরণ-ধারণ নিজস্ব প্রকৃতিভুক্ত হইয়া যায় যে, তাহাই কারিগরকে চালাইয়া লয়, কারিগর যদিই বা তাহাকে না চালাইতে পারে। অবশ্য বলি না, বাঙলা তাহার সমৃদ্ধির পরিপুষ্টির চরমে পৌঁছিয়াছে। কিন্তু যতখানি সমৃদ্ধি পরিপুষ্টি হইলে বলা যায় পূর্ণযৌবনের আরম্ভ তাহা আনিয়া দিয়াছেন রবীন্দ্রনাথ। আবার এ বিষয়ে রবীন্দ্রনাথ সাক্ষাতে কার্য্যত যতখানি যা করিয়াছেন, তাহার বেশি করিয়াছেন ভাবের দিক দিয়া, অসাক্ষাতে একটা আবহাওয়া সৃষ্টি করিয়া। ২১

জ) " যে কাব্য কেবলমাত্র রসধ্বনি লইয়া ব্যস্ত, যাহাতে বস্তুধ্বনি অত্যন্ত শিথিল, সে কাব্যের আলোচনা বাগাড়ম্বর মাত্র। রবীন্দ্রনাথের কাব্য সম্বন্ধে একথা খাটে না। কারণ রসধ্বনির মর্মস্বরূপ হইয়া যে বস্তুধ্বনি ফুটিয়া উঠিয়াছে, তাহাকে বিঘটন বা analysis - এর দ্বারা লোক লোচনের সম্মুখে না আনিলে সেই বস্তুধ্বনির অনুগত রসধ্বনিও স্ফুট হইয়া উঠিতে পারে না এবং সেইজন্য রসপ্রতীতির অস্ফুটতা

---

২১. নলিনীকান্ত গুপ্ত, / রবীন্দ্রনাথ, / রবীন্দ্রনাথ ও আধুনিকতা, / পৃ.স.৪৯-৫০ /

110533
2 OCT 1992

ও বিলম্ব একরূপ অনিবার্য্য। রবীন্দ্রনাথের জীবনটি কাব্যলীলায় ফুটিয়া উঠিয়াছে সেজন্য তাঁহার কাব্যগুলির সহিত পরস্পর একটি নিগূঢ় একান্বয় সম্পর্ক রহিয়াছে। এই একান্বয় সম্পর্ককে না বুঝিতে পারিলে কবির সমগ্র পুরুষীয় অনুভবের সহিত পরিচয় দুর্ঘট এবং সেইজন্য যে সমালোচক কবির কাব্যগুলিকে একান্বয়ে প্রকাশ করিতে চেষ্টা করেন তিনি যে কেবল বস্তুধ্বনিকে, তত্ত্বদৃষ্টিকে, কবির পঞ্জরীভূত সত্যকে প্রকাশ করেন তাহা নয়, কবির কাব্যের রসাস্বাদেরও প্রচুর অনুকূলতা করেন।" [২২]

ঝ) " বস্তুত:, রবীন্দ্রনাথের সকল প্রকার চিন্তা ও কর্ম্মপ্রচেষ্টা তাঁহার অন্তর্নিহিত সত্তার আত্মপ্রকাশের ইচ্ছা ছাড়া আর কিছু বলিয়া মনে করিতে পারি না। কাব্যে-সঙ্গীতে-গল্পে-নাট্যে-উপন্যাসে তিনি যেমন করিয়া আপনার আনন্দের ব্যাকুলতাকে প্রকাশ করিয়াছেন, রাষ্ট্রীয় ও সামাজিক কর্ম্মপ্রচেষ্টায়, শিক্ষাদান ও প্রচারে, তত্ত্বজিজ্ঞাসা ও ব্যাখ্যায়, অধ্যাত্মবোধ এবং তাহার প্রচারেও তিনি তেমন করিয়াই নিজেকে প্রকাশ করিয়াছেন। এই প্রকাশ কোনো নূতন *জ্ঞান* লাভের প্রেরণায় বা প্রয়োজনের তাড়নায় যে নয়, এ কথা আমি জোর করিয়াই বলিতে পারি। বিশ্বজীবনের বিচিত্র বিকাশের সঙ্গে মানুষের একটা নিবিড় যোগ আছে, বুদ্ধির সাহায্যে জ্ঞানের প্রেরণায় এ সম্বন্ধকে কেহ জানিতে চায়, প্রয়োজনের তাড়নায় এ সম্বন্ধকে কেহ আরো দৃঢ় করিয়া বাঁধিতে চায়। কিন্তু এই জাতীয় চেষ্টার বাহিরেও একটা চেষ্টা মানুষের আছে; মানুষ চায় এই সম্বন্ধটিকে, এই নিবিড় সংযোগের রসটিকে ভোগ করিতে, জানিতে নয়, অনুভব করিতে। এই ভোগের ক্ষুধা, অনুভূতির ক্ষুধাই মানুষের রূপসৃষ্টি কার্য্যে প্রবৃত্ত করে, তাহার নিদ্রিত চৈতন্যকে প্রকাশের তাড়নায় ব্যাকুল করিয়া তোলে। নানান্ যুগের, নানান্ দেশের ইতিহাস যে কাব্যে সঙ্গীতে চিত্রে ভাস্কর্য্যে মঞ্জুরিত হইয়া উঠিয়াছে, তাহার মূলে রহিয়াছে এই অনুভূতির ক্ষুধা, প্রকাশের প্রেরণা, নিজের সত্তার আনন্দবোধকে বিকশিত করিবার ব্যাকুল প্রয়াস। এই যে রবীন্দ্রনাথ বিশ্বজীবনের বিচিত্র প্রকাশের রসকে

---

২২. সুরেন্দ্রনাথ দাশগুপ্ত,/ রবিদীপিতা,/ মিত্র এন্ড ঘোষ,/ তারিখ অনুল্লিখিত,/ পৃ.স. ০৷৷০-৷৵০/ আলোচনা

ভোগ করিতে চাহিয়াছেন, তাহার মনে যে অনুভূতির ক্ষুধা জাগিয়াছে, তাহারই ফলে তিনি অদ্বিতীয় রূপস্রষ্টা, অদ্বিতীয় কবি। তাঁহার এই কবি মানস, বস্তুত: সকল প্রকার রূপমানসের মূলে আছে এই রসভোগের ইচ্ছা, অনুভূতির ক্ষুধা, প্রকাশের ক্ষুধা, - অভাবের প্রেরণা নয়, প্রয়োজনের তাড়না নয়।"[২৩]

পাশাপাশি ইংরেজীতে লিখিত কয়েকটি অনুরূপ মন্তব্য উদ্ধৃত করা গেল, যার ভেতর দিয়ে একই ভাবে রবীন্দ্রনাথকে এবং তাঁর কাব্যকে মিলিয়ে দেখবার চেষ্টা করা হয়েছে। যেমন :

ক) "Tagore is a fascinating subject for study because he himself was fascinated by everything under the sun. "Looking back", he recalled, "on childhood's days the thing that recurs most often is the mystery which used to fill both life and world ... It was as if nature held something in her closed hands and was similingly asking us : 'what d' you think I have ?' What was impossible for her to have was the thing we had no idea of." He never ceased to wonder at the immense variety of things to be found in nature's hands, or to be enchanted by the possibility of the next days surprise, and the next, and the next ... "[28]

---

২৩. জয়ন্তী উৎসর্গ, / শ্রী নীহাররঞ্জন রায়, / কবি রবীন্দ্রনাথ, / পৃ.স.৪৭২

২৪. Mary M Lago, Rabindranath Tagore, Twayne Publishers, Boston 1976, Chapter-4/ The other Tagore/ Page-115.

ঘ) "It is important now that he be considered, and reconsidered, in the roles in which he saw himself. He is a literary figure, not a sociological model, although his experience and his works illuminate Indian Social history. The West Knew him only briefly and imperfectly. A renewed if belated effort to know him more fully would provide its own rewards." [২৫]

"Tagore was above all a poet of course. He was thinker too, not of sorts but of a Pretty high sort. And strangely enough he was a man of action of no mean dimension in the fields of education, politics and social reform. Some maintain that it is difficult for a poet to be a thinker, and Vice-versa. Even more obvious is the incompatibility between the dreamy poet and the vigorous social reformer or the practical man who devotes a good part of his working hours to the exacting, irritating dull chores involved in running a big educational institution. Yet the call of action in various fields again and again came into conflict with the call of quiet, serene contemplation and its expression in art. That too is action, and action of

---

২৫. Mary M Hago/Rabindranath Tagore/Chapter 5/ conclusion : The Inescapable Man/Page-147.

a strenuous kind, though most of us (including Tagore himself) are apt to regard intellectual or artistic activity as a truancy from the demands of social duty. This conflict is as recurrent theme in Tagore's poetry, expressed in his earlier poetry as a determination to return to the world of action from the intoxicating embrace of the muse ("Turn Me Back to work" in Chitra) and in the poetry of his last phase as a sad realisation of faliure to have participated in the heroic tast of building the good society in the teeth of all the demonic forces." [২৬]

বস্তুত, উপরোক্ত উদ্ধৃতিগুলি ছাড়াও অসংখ্য আলোচনা রয়ে গেল, যা উল্লেখ করা যেতে পারতো একই সঙ্গে। আপাতত: বলা যায়, এখানে যেসব প্রাসঙ্গিক মন্তব্য তুলে ধরা হয়েছে, তার ভিতর দিয়ে সকলেই একটা কথা বলতে চেষ্টা করেছেন, তা এই যে রবীন্দ্রনাথের জীবন ও কাব্যের মধ্যে যেমন একটা অবিচ্ছেদ্য সম্পর্ক আছে, তেমনি তাঁর জীবন ও সৃষ্টির একটা অন্তর্নিহিত সত্যও আছে। অর্থাৎ রবীন্দ্রনাথের জীবন ও সৃষ্টি যেন একটা অদৃশ্য সূত্রে গাঁথা, যেন কবি তাঁর জীবনে উপলব্ধ কথাকেই বাণীরূপ দিয়েছেন। একথা অবশ্য অল্পবিস্তর সব লেখক সম্পর্কেই প্রযোজ্য, বিশেষত: যে কোন মহৎ লেখক সম্পর্কে। কিন্তু রবীন্দ্রনাথের ক্ষেত্রে পার্থক্য শুধু এই যে, সুদীর্ঘ জীবনের অধিকারী হবার ফলে রবীন্দ্রনাথের সৃষ্টি একটা অখন্ড রূপ নিতে পেরেছে এবং জীবনের সঙ্গে পা ফেলতে ফেলতে একটি নির্দিষ্ট লক্ষ্যে তা উপনীত হয়েছে। কবি নিজেই বলেছেন যে যখন তিনি

---

২৬. Abu Sayeed Ayyub/Tagore's Quest/Papyrus/April 1980/ Introductory Is that your delight/ Page-4-5.

একের পর এক কবিতা, গান, নাটক লিখেছেন, তখন সেগুলি এসেছিল স্বতন্ত্র রূপ নিয়ে। কিন্তু - অবশেষে দেখা গেল, তারা যেন একটা অদৃশ্য সূত্রে গাঁথা হয়ে কবির অন্তর্লোকের পরিচয় বহন করছে।

রবীন্দ্রনাথের কাব্যসৃষ্টির অন্তর্নিহিত তাৎপর্য সম্পর্কে এই পর্যন্ত যে ব্যাখ্যা পাই তা সহজবোধ্য। কিন্তু তার পরের কথাটা অনেকেই যথাযথ ব্যাখ্যা করতে পারেন নি। তা হচ্ছে - এই যে, কবির কাব্য সৃষ্টি (এবং অন্যান্য রচনাও) আসলে ক্ষনে ক্ষনে তাঁর জীবন ভাবণাকে রূপ দিয়ে গেছে। এক একটি ভাবনার উদ্ভব ও তার বিকাশের ছবিটি তাঁর বিশেষ একটি রচনার বদলে তাঁর সমগ্র রচনার মধ্যে বিধৃত হয়ে আছে। এই ভাবেই জীবনের বিচিত্র দিক্ সম্পর্কে তাঁর যে ভাবনা দেখা দিয়েছে, আমরা দেখতে পাই, তার একটা ক্রমবিকাশ আছে - অর্থাৎ এক একটি ভাবনা বিশেষ একটি মুহূর্তে উদ্ভূত হয়ে ধীরে ধীরে বিকাশ লাভ করে পরিণতি পেয়েছে। তাই বলা যেতে পারে, যাকে আমরা রবীন্দ্র কাব্যের মূল সুর বলি বা যাকে আমরা রবীন্দ্রনাথের জীবনদর্শন হিসেবে চিহ্নিত করি, তা আসলে রবীন্দ্রনাথের জীবনের নানান ভাবনার সমবায়ে রচিত। এখানেই রবীন্দ্রনাথের সৃষ্টির মূল রহস্য নিহিত।

কবি তাঁর সুদীর্ঘ জীবনে পৃথিবীর নানান জায়গায় থেকেছেন এবং দেশ-বিদেশের বিচিত্র জীবনকে দেখেছেন। স্বভাবতই এই বিচিত্র পরিবেশ তাঁর জীবনে ও রচনায় প্রভাব ফেলেছে। তথাপি, মূলত তিনটি পরিবেশ তাঁর জীবনে একটা স্থায়ী প্রভাব বিস্তার করেছে। এই সূত্রেই প্রমথ নাথ বিশী যথাক্রমে জোঁড়াসাঁকো, শিলাইদহ এবং শান্তিনিকেতন - এই তিন পর্বের কথা বলেছেন। রবীন্দ্রনাথের সৃষ্টির যে মৌল তিনটি উপাদান মানুষ, প্রকৃতি ও অরূপ এগুলি সংগৃহীত হয়েছে ঐ তিনটি পরিবেশ থেকে।[২৭] তিনি এ বিষয়ে মনোজ্ঞ ব্যাখ্যা ও বিশ্লেষণের সূত্রে বলেছেন যে জোড়াসাঁকো পর্বে কবির প্রকৃতি প্রীতি

---

২৭. রবীন্দ্রসরণি/ শ্রী প্রমথ নাথ বিশী

জাগ্রত হয়েছে। তারপর শিলাইদহ পর্বে তিনি মানুষকে দেখে মানবপ্রীতি লাভ করেছেন। সবশেষে শান্তিনিকেতনের তদানীন্তন নির্জন শূণ্য প্রান্তর পরিবেশ তাঁকে দিয়েছে অরূপানুভূতি।

রবীন্দ্রনাথের দার্শনিকতা তথা কাব্যের প্রেরণা বিশ্লেষণে অধ্যাপক বিশীর এই ব্যাখ্যা অনেকাংশে গ্রহণযোগ্য মনে হলেও, আসলে কবি এইসব অনুভূতি খন্ডিত ভাবে লাভ নাও করে থাকতে পারেন। যেমন, ধরা যাক্, জোড়াসাঁকো পর্বের কথা। একথা ঠিক যে জোড়াসাঁকো পর্বে কবির জীবনের চারদিকে অসংখ্য বন্ধন ও বাধা ছিল। ফলে, দূর থেকে আড়াল-আবডাল থেকে প্রকৃতিকে দেখেছেন এবং প্রকৃতির জন্য গভীর ব্যাকুলতা বোধ করেছেন। কিন্তু শিলাইদহ পর্বে কবি কি শুধু মানুষকেই দেখেছেন, প্রকৃতিকে দেখেননি ? অথবা তখন কি অরূপের হাতছানি অনুভব করেন নি ? আমার ধারণা, রবীন্দ্রনাথের জীবনে এই তিনটি মৌল উপাদান এই রকম ভাবে অর্থাৎ খন্ড খন্ড ভাবে নাও সঞ্চিত হয়ে থাকতে পারে। কিন্তু, একথা অবশ্যই সত্য যে, কবি পৃথিবীর প্রান্ত প্রান্তান্তরে ঘুরে বেড়িয়েছেন, বিচিত্র জীবনের স্বাদ পেয়েছেন, তাঁর জীবনে অধ্যাপক বিশী কথিত তিনটি পর্বের প্রভাব সবচেয়ে বেশি এবং নিশ্চিত ভাবে পড়েছে।

আসল কথা হচ্ছে, আমাদের সামনে দুটি জগৎ প্রসারিত। মাথার উপর অনন্ত আকাশ আর অগণিত গ্রহ-নক্ষত্র, চন্দ্র-সূর্য-তারা। এই অনন্ত জগৎ মৌন হলেও স্বাভাবিক কারণেই কবি বারংবার এই মৌন বিশ্বের দিকে তাকিয়েছেন, ভেবেছেন। অন্যদিকে প্রসারিত পার্থিব জগৎ। যেখানে অনেকটা জায়গা জুড়ে বসে আছে প্রকৃতি, আর তার সঙ্গে মানবজীবন। ওয়ার্ডসওয়ার্থ একদা বলেছিলেন যে, মানুষ সব কিছু পেতে পারে প্রকৃতির কাছ থেকে। আমার ধারনা, রবীন্দ্রনাথও একথা মনে-প্রাণে অনুভব করেছেন। প্রকৃতিকে রবীন্দ্রনাথ আড়াল-আবডাল থেকে দেখেননি শুধু, দেখেছেন সামনা-সামনি এবং তার মর্মেও প্রবেশ

করেছেন। আমার অনুমান, রবীন্দ্রনাথের জীবনে প্রকৃতির প্রভাব সবচেয়ে বেশি, এবং প্রকৃতিই রবীন্দ্রসৃষ্টির মৌল প্রেরণা। রবীন্দ্রনাথের চিঠিপত্র এবং বিভিন্ন রচনা তার পরিচয় বহন করছে। শুধু তাই নয়, প্রকৃতি অনেক ক্ষেত্রেই প্রতীক হয়ে রবীন্দ্রনাথের কাছে দেখা দিয়েছে। সর্বোপরি, রবীন্দ্রনাথের সৃষ্টিধর্মী রচনার, ধরা যাক্ কবিতা, গান ও নাটকের কথা, সবচেয়ে বেশী ভূমিকা প্রকৃতির। ঋতুচক্রের পরিবর্তন থেকে শুরু করে প্রকৃতির বিচিত্র রূপে রবীন্দ্রনাথকে ক্ষনে ক্ষণে মুগ্ধই করেনি, তা তাঁর জীবন ভাবনার সবচেয়ে বেশি প্রেরণা যুগিয়েছে।

এবং মানুষ। মানুষের জীবনও প্রকৃতির মতোই বিচিত্র। রবীন্দ্রনাথ জন্মসূত্রে যে পারিবারিক পরিবেশ পেয়েছিলেন, সেই পরিবেশের অনেকটাই তৈরী তাঁর পরিবারের লোকজনদের। তিনি ঋষিকল্প তাঁর বাবা ও দাদাকে দেখেছেন, দেখেছেন জ্যোতিরিন্দ্র বা নতুনদাকে, দেখেছেন বৌঠান কাদম্বরীকে। আরো অনেককে। তাছাড়া, তাঁদের পরিবারে যেসব লোকজনের যাতায়াত ছিল, তাঁদেরও দেখেছেন। এককথায়, মানুষের সঙ্গ তিনি নিবিড়ভাবেই পেয়েছেন। এদিক থেকেও তিনি সত্যিই ভাগ্যবান। দেশ-বিদেশের কতো মানুষকেই না তিনি তাঁর জীবনে পেয়েছেন। স্বভাবতই পারিবারিক পরিবেশ থেকে শুরু ক'রে তাঁর সমকালীন সমাজ, দেশকালের অর্থাৎ মানব সমাজের প্রভাব তাঁর মনে গভীর-ভাবেই পড়েছে। এই সূত্রে তিনি একদিকে যেমন মানবজীবনের উজ্জ্বল দিকগুলি প্রত্যক্ষ করেছেন, অন্যদিকে তেমনি মানুষের জীবনের অন্ধকার দিকগুলিও দেখেছেন। এইভাবেই মানুষের জন্ম-মৃত্যু, পাপ-পুণ্য থেকে শুরু করে বিচিত্র আবেগ সুখ-দুঃখকে অনুভব করেছেন। প্রেমে, বেদনায়, ত্যাগে যে মানুষ মহৎ সেই মানুষই হয়ে ওঠে পাপে-ভোগে-সংক্রীর্ণতায় পশুর সমগোত্রীয়। বলা বাহুল্য, রবীন্দ্রনাথ মানুষের মহত্ত্বকে যেমন স্বীকার করেছেন, তেমনি জেনে নিয়েছেন মানবজীবনের অন্ধকার দিকগুলি। এবং আলো-অন্ধকার পরিবৃত এই যে মানব জীবন তা কবির রচনায় সমভাবে বিধৃত হয়েছে। এই নয় যে

তিনি শুধু আলোর দিকে তাকিয়েছেন, অন্ধকারের দিকে চোখ বুজে থেকেছেন। তা ঘটেনি। তিনি জীবনের সব কিছুকেই স্বাভাবিক ভাবে গ্রহণ করেছেন, কেননা, এ সবই জীবনের সত্যরূপ। সুতরাং মানবজীবনের ভালো-মন্দ, ন্যায়-অন্যায়, আলো-অন্ধকার সব কিছুই তাঁর জীবনভাবনার অনুসঙ্গী হয়ে উঠেছে।

এরই পাশাপাশি অরূপানুভূতি, যা সমগ্রভাবে রবীন্দ্রসৃষ্টির উৎস ও উপাদান। অনেক সমালোচক একদা রবীন্দ্রনাথের সমগ্র সৃষ্টির মধ্যে এই অরূপানুভূতির ওপর প্রাধান্য দিয়েছিলেন। পশ্চিমী পাঠকসমাজ ও সমালোচক গোষ্ঠীর একাংশ একদা রবীন্দ্রনাথকে **'mystic'** কবি হিসেবে চিহ্নিত করেছিল, যেন রবীন্দ্রসাহিত্যে এ ছাড়া আর কিছু নেই। অথবা, একশ্রেণীর সমালোচক যে কোন রবীন্দ্ররচনার এই আধ্যাত্মিকতা বা অরূপানুভূতির রং লেপন করতে চেয়েছেন এবং তার ভিতর দিয়ে মানুষ রবীন্দ্রনাথকে নয়, ঋষি রবীন্দ্রনাথের সত্তাকে তুলে ধরেছেন। প্রসঙ্গত, স্মরণ করা যেতে পারে, রবীন্দ্রনাথকে যেভাবে বিদেশী পাঠক সমাজের জন্য অনুবাদ করা হয়েছে, সেখানেও মূলত: এই ধরণের লেখার ওপরই জোর দেওয়া হয়েছে। ফলে রবীন্দ্রনাথের কাব্য যে মূলত: **mystic,** এই ধারণাটাই বদ্ধমূল হয়ে দাঁড়িয়েছে। বলাবাহুল্য কবি সম্পর্কে এমন একটি ধারণা গড়ে তোলার পেছনে রবীন্দ্রনাথের নিজেরও একটা বড় ভূমিকা আছে। রবীন্দ্রনাথ তাঁর বাবার ভিতর দিয়ে সেই যে আধ্যাত্মিকতার অংকুর রোপণ করেছিলেন বাল্যকালে, পরবর্তীকালে তাই তাঁর জীবনে মহীরুহ হয়ে দেখা দিয়েছে। এর স্বাক্ষর রয়ে গেছে তাঁর অসংখ্য চিঠিতে, কবিতায়, গানে, নাটকে এবং প্রবন্ধে। রবীন্দ্রনাথ নিজেই সীমা ও অসীমের কথা বলেছেন, তার মিলনসাধনাই যে তাঁর সমগ্র রচনার মৌল প্রেরণা, তাও তিনি উল্লেখ করতে ভোলেন নি। নিজের জীবনের অন্তরহস্যের কথা বলতে গিয়ে তিনি নিজেই 'জীবনদেবতার' কথা, দুই 'আমি'র কথা বলেছেন। কবির এইসব ধারণা নিঃসন্দেহে জটিল আধ্যাত্মিকতা, যা তাঁর অরূপানুভূতির সঙ্গে সংশ্লিষ্ট। সুতরাং এই অরূপানুভূতি সেই কারণেই তাঁর জীবনে ও সাহিত্যে একটি মূল্যবান উপাদান। তিনি এই অনুভূতি শান্তিনিকেতনের শূণ্য প্রান্তর

থেকে অর্জন করেছিলেন কিনা জানিনা, যেমন বলেছেন অধ্যাপক বিশী, কিন্তু একথা ঠিক - অনন্ত আকাশ এবং আকাশে পরিবৃত গ্রহ-নক্ষত্র, চন্দ্র-সূর্য-তারা তাঁকে নিরন্তর আহ্বান জানিয়েছে। বিশ্বজীবনের রহস্যকে জানবার জন্যে তাঁর মন নিরন্তর ব্যাকুল হয়ে উঠেছে এবং ধীরে ধীরে এ বিষয়ে তাঁর মধ্যে একটা স্থির অনুভব দেখা দিয়েছে। তিনি তাই বারংবার অসীম বা অরূপের কথা বলেছেন। বলেছেন, কেন না, তা তাঁর জীবনভাবনার অনেকটা জায়গা জুড়ে আছে।

এইভাবেই, দেখা যাচ্ছে, আমাদের সামনে প্রসারিত বিশ্বজগৎ রবীন্দ্রনাথের জীবনে যে রেখাপাত করেছে পর্বে পর্বে, তার থেকেই জন্ম নিয়েছে তাঁর জীবনভাবনা। রবীন্দ্রনাথকে প্রকৃত অর্থে বা আক্ষরিক অর্থে দার্শনিক বলা যায় কিনা তা তর্কের নিয়ম হতে পারে। কেন না, তিনি নিজেকে কবি ছাড়া আর কোন মর্যাদায় ভূষিত করতে চান নি।

> " জীবনের এই দীর্ঘ চক্রপথ প্রদক্ষিন করতে করতে বিদায় কালে আজ সেই চক্রকে সমগ্ররূপে যখন দেখতে পেলাম তখন একটা কথা বুঝতে পেরেছি যে, একটিমাত্র পরিচয় আমার আছে, সে আর কিছুই নয়, আমি কবি মাত্র। আমার চিত্ত নানা কর্মের উপলক্ষে ক্ষণে ক্ষণে নানা জনের গোচর হয়েছে। তাতে আমার পরিচয়ের সমগ্রতা নেই। আমি তত্ত্বজ্ঞানী শাস্ত্রজ্ঞানী গুরু বা নেতা নই - একদিন আমি বলেছিলাম, 'আমি চাইনে হতে নবরঙ্গে নবযুগের চালক' - সে কথা সত্য বলেছিলাম।" [২৮]

কিন্তু একজন দার্শনিকের কাছে যে প্রত্যাশা আমাদের থাকে, তা রবীন্দ্রনাথের মধ্যে প্রচুর পরিণামে রয়েছে। দর্শনের যদি মূল কথা হয় সত্যানুসন্ধান, তাহলে সে কাজ তো রবীন্দ্র নাথও করেছেন। তবু, এত সত্ত্বেও আমরা তাঁকে কবি হিসেবেই দেখতে চাই, দার্শনিক হিসেবে নয়।

---

২৮. আত্মপরিচয় / পৃ.স.২০৫-২০৬, / প্রবন্ধ-৪

"কিন্তু যেহেতু রবীন্দ্রনাথ পেশাদার দার্শনিক নন, যেহেতু - প্রধানতঃ তিনি কবি, যেহেতু তাঁর তত্ত্বমূলক রচনাও রূপময় বিগ্রহ, সেই হেতু অনেকেই তাঁকে দার্শনিক বলে স্বীকার করেন না।"[২৯]

কিন্তু কার্যত জীবনভাবনা এক অর্থে এক ধরণের দার্শনিক অনুভূতি। আমাদের ভাবনাগুলির প্রত্যেকটির একটা বাস্তবভিত্তি থাকে। এইসব বাস্তব ভিত্তি থেকেই জন্ম নেয় একটি ভাবনা। এই ভাবনা তো একধরণের বিশ্বাসও বটে। সুতরাং যাকে আমরা বিশ্বাস বলি, যাকে আমরা সত্যানুভূতি বলি, তা আসলে জীবনভাবনারই নামান্তর। সুতরাং জীবনভাবনাকে এক অর্থে দার্শনিক উপলব্ধিও বলা যায়। তবু, গভীরতর অর্থে জীবনভাবনার একটি গভীর তাৎপর্য রয়েছে। একজন দার্শনিক মানবজীবনের দায়-দায়িত্ব পালন না করে বনবাসে বাণপ্রস্থে গিয়েও জীবন ও জগতের সত্যোপলব্ধি করতে পারেন॥ সেক্ষেত্রে তাঁর যে প্রজ্ঞা, যে সত্যোপলব্ধি, তাঁকে জীবনসঞ্জাত বলা যাবে না, অর্থাৎ একথা বলা যাবে না যে তাঁর এই উপলব্ধি জীবন থেকে উঠে এসেছে। সিদ্ধার্থ যখন বুদ্ধদেব হলেন তখন তাঁর প্রজ্ঞা মানবজীবনের নিগূঢ় সত্যকে উদ্‌ঘাটিত করল। কিন্তু তিনি কী করলেন ? তিনি জীবন থেকে সরে গিয়ে সত্যে পৌঁছলেন। অর্থাৎ তাঁর সত্যোপলব্ধির জন্য জীবনকে প্রয়োজনে হল না। এইভাবেই, জীবন নিরপেক্ষ সত্যের উপলব্ধিও সম্ভব হতে পারে - যা অতি উচ্চস্তরের দার্শনিকতা বলে গণ্য হবার যোগ্য। বস্তুত, ভারতীয় দর্শনের অনেকগুলি তত্ত্বই তো জীবনকে পরিহার করার আহ্বান জানিয়েছে এই বলে, জীবন হচ্ছে অনিত্য তাই অসত্য। সত্য সেই পরমপুরুষ অর্থাৎ ঈশ্বর। অতএব দেখা যাচ্ছে, অতি উচ্চস্তরের দার্শনিক তত্ত্বেও মানবজীবনের বাস্তব কোন ভূমিকা নাও থাকতে পারে।

জীবনভাবনার ক্ষেত্রে এমনটি হবার কথা নয়। জীবনভাবনাও সত্যেরই উপলব্ধি। কিন্তু এই উপলব্ধি জীবন নিরপেক্ষ নয়, জীবনের গভীর থেকেই উঠে আসে এই উপলব্ধি।

---

২৯. রবীন্দ্রনাথের বিশ্বাসের জগৎ/ শ্রী সত্যেন্দ্রনাথ রায়/ পৃ.স.৬,/ গ্রন্থালয় প্রাইভেট লিমিটেড/ ২২শে শ্রাবণ, ১৩৮৭/

প্রশ্ন উঠবে, জীবনভাবনা যদি সত্যোপলব্ধি বা দার্শনিকতা হয়, তাহলে তার জন্ম হয় কীভাবে ? এর উত্তরে বলতে পারি, মানুষের জীবনে যা কিছু ঘটে, যা কিছুর অস্তিত্ব - তাকে স্বীকার করেই, তাকে এড়িয়ে গিয়ে নয়, জীবনভাবনা সৃষ্টি হয়। যেমন, দৃষ্টান্ত দিয়ে বলতে পারি, জীবনের কতকগুলো স্থূল প্রয়োজনের দিক্ আছে। যার অন্যতম হল জৈবতা বা যৌণতা। শংকরাচার্যের মতো দার্শনিক বলবেন, এ হচ্ছে মানুষের নয়, পশুর প্রবৃত্তি। এই আসক্তি ত্যাগ করতে না পারলে, এর মায়া অতিক্রম করতে না পারলে ব্রহ্মের উপলব্ধি হয় না। অদ্বৈতবেদান্ত এই পর্যন্ত বলেই খালাস। কিন্তু কোন্ মানবদেহ যৌণতার ফসল নয় ? যৌণানুভূতি তো জীবনের অঙ্গ, অন্যতম প্রধান উপাদান। সুতরাং তাঁকে অস্বীকার করার উপায় নেই। একইভাবে, মানুষের জীবনে আরো অনেক প্রবৃত্তির অস্তিত্ব আছে যা পশুসমাজেরও বটে। অথচ, এই মানুষই প্রেমে, ত্যাগে মহৎ হয়ে ওঠে। বস্তুত, জীবনের তুচ্ছাতিতুচ্ছ সব কিছুর অস্তিত্ব মেনে নিয়েই যে উপলব্ধির জন্ম, তাকেই বলতে পারি জীবনভাবনা।

তাই দার্শনিক রবীন্দ্রনাথের সেক্ষেত্রে জীবন থেকে সরে গিয়ে একটা মহৎ দার্শনিক তত্ত্বের সৃষ্টি করতে পারতেন, কবি রবীন্দ্রনাথ জীবনের মাঝখানে দাঁড়িয়ে জীবনের সবকিছুকে স্বীকার করেই যেসব বোধ গড়ে তুলেছেন, যেসব উপলব্ধি করেছেন, আমরা তাকেই বলতে চাই - রবীন্দ্রনাথের জীবনভাবনা। এককথায়, মানুষের জীবনকে কেন্দ্র করেই বিধৃত হয়েছে তাঁর জীবনভাবনা। তাঁর এই জীবনভাবনাকে দার্শনিকতা বলা গেলেও যেতে পারে, এবং তা হয়ত একধরণের দর্শন।[৩০] তথাপি প্রথাগত দার্শনিকতা ও তাঁর জীবনভাবনার এই মৌল পার্থক্যটুকু স্পষ্টত মনে রাখা দরকার। রবীন্দ্রসৃষ্টির প্রকৃতপক্ষে তাঁর জীবনভাবনারই প্রকাশ, এই কথাটা প্রসঙ্গত স্পষ্ট করে মনে রাখাও প্রয়োজন।

বলা বাহুল্য, জীবনভাবনা যেহেতু একজন ব্যক্তির জীবনের অভিপ্রকাশ, তাই জীবনভাবনা বস্তুত বিশেষ ব্যক্তির বিশেষ দৃষ্টিভংগীও বটে। অর্থাৎ জীবনকে প্রত্যেক মানুষ

---

৩০. Philosophy of Tagore/S.Radhakrishnan/Good companions publishers Barada(India)/1961 published in India/ philosophy of Rabindranath Tagore.

তার স্বকীয় দৃষ্টিতে দেখে এবং তার থেকেই গড়ে ওঠে বিশিষ্ট জীবনবোধ বা ভাবনা। রবীন্দ্রনাথের জীবনভাবনাও তাই বিশেষভাবে তাঁর নিজের দৃষ্টিভংগীতে দেখা জীবনের সত্যোপলব্ধি। জন্মসূত্রে আমরা কিছু জৈবিক সত্তার অধিকারী। আবার মানুষ যেহেতু যুক্তিনিষ্ঠ প্রাণী, তাই তার জৈব সত্তাকে অতিক্রম করে তার মধ্যে সক্রিয় হয়ে ওঠে মহত্তর মানবিক প্রকাশ। জন্ম-মৃত্যু, পাপ-পুণ্য, সুখ-দুঃখ, আনন্দ-বেদনা, আশা-হতাশা, প্রেম-বিরহ,- ইত্যাদিতে পরিকীর্ণ মানবজীবনের এই যে সব বিচিত্র দিক, তা সমভাবে সকল মানুষকে স্পর্শ করে না, অথবা অন্যভাবে বলতে গেলে, একই দৃষ্টিভংগীতে জীবনের এই সব দিক সকলের কাছে একভাবে প্রতিফলিত হয় না। প্রত্যেক মানুষ স্বতন্ত্র দৃষ্টিতে এগুলির পরিচয় লাভ করে। রবীন্দ্রনাথও স্বভাবতই তাঁর নিজস্বদৃষ্টিতে জীবনের এইসব দিকগুলি উপলব্ধি করেছেন এবং তাদের সম্পর্কে একটি বিশিষ্ট ধারণা গড়ে তুলেছেন, যা একান্তই তাঁর আর কারো নয়।

যেমন ধরা যাক্, প্রেম, প্রেম মানবজীবনের একটি সাধারণ ধর্ম ও প্রবণতা। প্রেমকে কেন্দ্র করে নানান কাহিনী, তত্ত্ব রচিত হয়েছে। কিন্তু প্রেম তো জীবনেরই অঙ্গ। তাই জীবনের দিকে তাকিয়ে নিজস্ব অভিজ্ঞতা দিয়ে প্রেমের উপলব্ধি প্রয়োজন। রবীন্দ্রনাথও তাঁর জীবনে প্রেমের স্বাদ পেয়েছেন এবং এ বিষয়ে তাঁর একটি বিশেষ ভাবনা জন্ম নিয়েছে যার স্বাতন্ত্র্য লক্ষনীয়। তেমনি, পাপ সম্পর্কে বা মৃত্যু সম্পর্কে আমাদের একটা প্রথাগত ধারণা আছে। এবং এই ধারণাগুলি আমাদের জীবনে বিশেষ প্রভাব বিস্তার করে থাকে। এই ধারণা একদিকে যেমন শাস্ত্রের মাধ্যমে পাই, অন্যদিকে তেমনি ব্যক্তি জীবনের অভিজ্ঞতা দিয়েও অনুভব করি। রবীন্দ্রনাথও তাঁর ব্যক্তিজীবনের ভাবনা দিয়েই এ বিষয়ে একটি বিশেষ বোধ বা ধারণা গড়ে তুলেছেন, যা একান্তভাবে তাঁর নিজস্ব। এইভাবেই, রবীন্দ্রনাথের জীবনভাবনার মূল কথা হল - এই জীবনভাবনা তাঁর নিজের জীবনেরই অভিপ্রকাশ, যা তাঁর রচনায় বিধৃত হতে দেখি। অবশ্য, তাঁর এই বিশিষ্ট জীবনভাবনা কীভাবে গড়ে উঠেছে, তার অর্ন্তনিহিত রহস্য ঠিকমতন উদ্‌ঘাটন করা প্রায় অসম্ভব, কেননা, মানুষের

মনে ভাবনার স্রোত কীভাবে জন্ম নেয়, কিংবা কীভাবে প্রভাবিত হয়ে চলে, দুর্জ্ঞেয় ব্যাপার, তার রহস্য মানবমনেই নিহিত থাকে। বাইরে থেকে তার অস্তিত্ব অনুভব করা যায় না। তাই, রবীন্দ্রনাথের জীবনভাবনা কীভাবে গড়ে উঠেছে, তা সবসময় তথ্য দিয়ে বোঝানো বা প্রমাণ করা যাবে না।

রবীন্দ্রনাথের জীবনভাবনার বিশিষ্ট আরো একটি দিক আছে। আমরা সবাই জানি রবীন্দ্রনাথ মূলতঃ অন্তর্মুখীন প্রকৃতির কবি। অর্থাৎ তাঁর মানসিক গঠন অনুসারে তিনি সবসময় বাইরের বস্তুজগত থেকে নিজেকে সরিয়ে নিয়ে নির্বস্তু মনোজগতের আশ্রয় নিয়েছেন। এর ফল হয়েছে এই, তাঁর সৃষ্টি মূলত **abstruction** এ গঠিত। তাই, প্রথাগতভাবে তাঁর সৃষ্টির মধ্যে যদি আমরা বস্তুধর্মিতা খুঁজতে চেষ্টা করি, সে চেষ্টা ব্যর্থ হবে। ফলত, রবীন্দ্রনাথের জীবনভাবনাও অনুরূপভাবে একান্তই **abstract.** এবং এরই মধ্যে রবীন্দ্রনাথের জীবনভাবনার মৌল সত্য নিহিত। রবীন্দ্রনাথের জীবনভাবনার এই বিশিষ্ট প্রকৃতির কথা অনুধাবন করা প্রয়োজন।

বস্তুত, রবীন্দ্রনাথের জীবনভাবনার অন্তর্নিহিত তাৎপর্য হল বিশ্ববিধানের বা জীবনের সত্যানুসন্ধান, যা দার্শনিকদেরও অন্বিষ্ট। আমরা ইতিমধ্যে লক্ষ্য করেছি, রবীন্দ্রনাথ যুগপৎ অনন্ত বিশ্ব ও পার্থিব জীবনের দিকে তাকিয়েই এই সত্যে উপনীত হতে চেয়েছেন। তিনি জীবনের সব কিছুকে গ্রহণ করেই, কোন কিছু বর্জন না করে জীবনের ঐ ধ্রুব সত্যকে উপলব্ধি করতে চেয়েছেন ক্ষনে ক্ষনে, পর্বে পর্বে। গভীরতর অর্থে, তাঁর এই সত্যানুসন্ধান আসলে উপনিষদের প্রাচীন ঋষিদের মতোই, যারা শেষপর্যন্ত মন বা অন্তরকেই উপলব্ধির জগৎ বলে স্বীকার করেছেন। মানুষ বিভিন্ন বেদ পাঠের ভিতর দিয়ে নানান জ্ঞান লাভ করতে পারে। কিন্তু 'মানস বেদ'ই তাঁকে চরম সত্যের উপলব্ধিতে উপনীত করে।

রবীন্দ্রনাথের মধ্যেও তাই আমরা দেখতে পাই। আমরা যদি সমগ্র রবীন্দ্রকাব্য যথাযথ ও যথার্থ রূপে অনুধাবন করি, তাহলে দেখবো - আসলে সমগ্র সৃষ্টির মধ্যে নিহিত আছে একটি গভীর নিবিষ্ট মন, তাই প্রকৃত পক্ষে রবীন্দ্রসৃষ্টি যতোটা অন্তর্জগতের ব্যাপার, ততটা বহির্জগতের নয়। এই কারণেই, বারংবার তাঁর সাহিত্যে, বস্তুধর্মিতার অভাবের অভিযোগ উঠেছে। অভিযোগ যাই হোক্, আসলে একথা সত্য যে, রবীন্দ্রসাহিত্য তাঁর এই নিবিষ্ট, নিবিড় মনের সৃষ্টি। এবং তাঁর এই মনই তাঁর জীবন-ভাবনারই উৎস। কবি, তাঁর জীবনের শেষ পর্বে বারংবার তাই মনের দিকে তাকিয়েছেন এবং বহির্জগৎ থেকে তাঁর দৃষ্টি ফিরিয়ে নিয়েছেন। তাঁর এই প্রবণতা আসলে উপনিষদের ঋষির 'মানস বেদ'র প্রবণতা, যার ভিতর দিয়ে প্রকৃত সত্যের অনুভব সম্ভব হয়। ক্ষিতিমোহন সেনের মন্তব্য এ প্রসঙ্গে গ্রহণযোগ্য।

> **"Rabindranath is a follower of this "Manasa Veda", and thus he spiritually belongs to one family with those seekers after truth who in ancient India had followed and realised this veda of their inner mind. This is why in Rabindranath's literature one so often meets with ancient ideas and truths which seem to have taken therein a new birth in our own age."** [৩১]

রবীন্দ্রনাথের জীবনভাবনার স্বরূপ উদ্‌ঘাটন করতে গিয়ে তাই আমাদের বারংবার রবীন্দ্রনাথের মনের কাছে পৌঁছাতে হবে। তার নাগাল পেতে হবে।

---

৩১. The Visva Bharati Quarterly/Editor Hirendranath Datta/ Tagore centenary Number/Vol.xxvi 3 and 4/ April-1962/ Page-44/ The Genius of Rabindranath - Its character and lineage/ KSHITIMOHAN SEN

রবীন্দ্রনাথের জীবনভাবনা সম্পর্কে যে ধারণাটি ব্যক্ত করা হল, তারই সূত্র ধরে অতঃপর বর্তমান গবেষণার আলোচ্য বিষয়ের দিকে দৃষ্টিপাত করা গেল। গবেষণা-কর্মের প্রণালীতত্ত্ব অনুসারে আলোচ্য বিষয়টি প্রস্তাবনা ছাড়া, মোট আটটি অধ্যায়ে বিভক্ত। এগুলির আলোচ্যসূচী নিম্নরূপ :

প্রথম অধ্যায় : প্রকৃতি
দ্বিতীয় অধ্যায় : প্রেম
তৃতীয় অধ্যায় : সৌন্দর্যবোধ
চতুর্থ অধ্যায় : মর্ত্যপ্রীতি
পঞ্চম অধ্যায় : অরূপানুভূতি
ষষ্ঠ অধ্যায় : পাপ ও অমঙ্গলবোধ
সপ্তম অধ্যায় : মৃত্যু

এছাড়াও আরো আছে যথাক্রমে অষ্টম অধ্যায় এবং উপসংহার। অষ্টম অধ্যায়ের বিষয়বস্তু - জীবনভাবনা থেকে জীবন দর্শন-এ উপনীত হবার প্রসঙ্গ। উপসংহারে সমগ্র আলোচনাটির পূর্বাপরতা সূত্রে পর্যালোচনা ও গবেষনা অধীতব্য বিষয়টিকে প্রতিষ্ঠিত করার প্রয়াস।

লক্ষ্য করা দরকার, রবীন্দ্রনাথের জীবনভাবনার স্বরূপ বিশ্লেষণ করতে গিয়ে আমরা তার পরিপ্রেক্ষিতে মোট ৭টি প্রসঙ্গ নির্বাচন করেছি। যদিও জানি এর বাইরে বহু **aspect** বা প্রসঙ্গ থেকে গেছে। কেন আমরা এই ৭টি প্রসঙ্গ বর্তমান আলোচনার অন্তর্ভুক্ত করেছি, তার কারণ হলো - আমরা মনে করি মূলত এই ৭টি দিক্‌ই তাঁর জীবনভাবনার মৌল উপাদান। এই সব দিকের বাইরেও অনেক এমন দিক আছে যা রবীন্দ্র নাথের জীবনভাবনার অন্তর্গত এবং তাঁর রচনায় তাদের স্থানও আছে। কিন্তু আপাতত সেইসব প্রসঙ্গ আমাদের আলোচনার অন্তর্ভুক্ত করতে চাইনি, কারণ উল্লিখিত সাতটি

প্রসঙ্গকে কেন্দ্র করেই সুষ্ঠু ও সম্যক্ রূপে রবীন্দ্রনাথের জীবনভাবনার স্বরূপটি উদ্‌ঘাটন করা সম্ভব হবে বলে আমাদের বিশ্বাস।

বাস্তবিকপক্ষে আমরা যে সাতটি প্রসঙ্গ আলোচ্যবিষয়ের মধ্যে গ্রহণ করেছি, তার প্রথমেই আছে প্রকৃতির স্থান। বলাই বাহুল্য, যেমন আগে উল্লেখ করেছি, রবীন্দ্রনাথের জীবনে প্রকৃতিই তাঁর সবকিছু উপলব্ধির মূল উৎস। তাছাড়া, তিনি যখন মানুষ ও অরূপের কথা বলেছেন সেখানেও এসেছে প্রকৃতির অনুসঙ্গ। অর্থাৎ প্রকৃতিই হচ্ছে মূল উপাদান যা প্রায় অবিচ্ছেদ্যভাবে তাঁর অন্যান্য চেতনার সঙ্গে জড়িত তাই প্রকৃতি প্রসঙ্গই প্রথমে স্থান পেয়েছে।

এরপরে পর্যায় ক্রমে এসেছে প্রেম, সৌন্দর্য, মর্ত্যপ্রীতি, অরূপানুভূতি থেকে শুরু করে পাপ-অমংগলবোধ, মৃত্যুচেতনা। এখানেও লক্ষ্য করার বিষয় এই যে, এইসব প্রসঙ্গই রবীন্দ্রনাথের সৃষ্টির অন্যতম মুখ্য উপাদান এবং এগুলিই কখনো খন্ডভাবে, কখনো অখন্ডভাবে রবীন্দ্রনাথের জীবনভাবনার আশ্রয় পেয়েছে। এদের পরস্পরের মধ্যে পারম্পর্য ও সাদৃশ্য যেমন আছে, তেমনি আছে বৈসাদৃশ্য। যেমন, প্রেমের নিজস্ব একটি রূপ আছে, তা আপন ঐশ্বর্যে ঐশ্বর্যবান, কিন্তু অন্যদিকে তা আবার মর্তজীবনের সঙ্গে জড়িত বলেই তার সঙ্গে মর্ত্যপ্রীতির পারম্পর্য রয়েছে। একইভাবে প্রেমকে যদি অন্যপ্রান্ত থেকে দেখা যায় তাহলে তাকে অরূপানুভূতির সঙ্গে মিলিয়ে দেখতে বাধা থাকার কথা নয়। এগুলির পারস্পরিক পারম্পর্য ও সাদৃশ্যসুলভ নৈকট্য লক্ষণীয়। পাশাপাশি পাপ-অমঙ্গলবোধ ও মৃত্যু এই প্রসঙ্গগুলি জীবনের অন্ধকারের দিকে অঙ্গুলি নির্দেশ করে। বলা বাহুল্য, এই অর্থেই এই প্রসঙ্গগুলি পরস্পরের নিকটবর্তী। আবার এগুলি পূর্ববর্তী প্রসঙ্গগুলির সঙ্গে এদের বৈপরীত্যও রয়েছে।

অথচ দেখা যাচ্ছে, রবীন্দ্রনাথ এই সাদৃশ্য ও বৈসাদৃশ্য সম্পর্কে অবহিত হয়েও সবগুলিকে পাশাপাশি ঠাঁই দিয়েছেন। তাদের অস্তিত্বকে স্বীকার করে নিয়েছেন। কোনটাকেই

অদ্ভুৎ জ্ঞান করে বর্জনীয় মনে করেন নি। কারণ তিনি জানেন, জীবনে যেমন আলো আছে, তেমনি অন্ধকারও বিদ্যমান। জীবনে যদি অরূপের অনুভূতি-সত্য হয়, তাহলে জীবনে পাপের অস্তিত্বও সত্য। যে প্রকৃতি আনন্দে বিস্ময়ে জীবনকে ভরিয়ে দেয়, সেই প্রকৃতিই হয় ধ্বংসের কারণ। প্রকৃতির মতোই মানবজীবনে আনন্দ বেদনা, সৃষ্টি ও ধ্বংস নিয়ে এক লীলা সংস্কারমান। সেই লীলা থেকেই যদি জীবনের সূচনা হয়, তবে সেই লীলাই এনে দেয় মৃত্যুকে। রবীন্দ্রনাথ মানবজীবন তথা বিশ্বজীবনের এই অর্তনিহিত লীলাময় রহস্যকে ঠিকমতো অনুভব করতে পেরেছিলেন বলেই নিছক আলোর দিকে তাকিয়ে না থেকে অন্ধকারের কথাও ভোলেন নি। কারণ বিশ্বচরাচরে কালপ্রবাহে সবই ভেসে চলেছে আপন আপন অস্তিত্ব নিয়ে। রবীন্দ্রনাথের জীবন-ভাবনায় এই কয়েকটি প্রসঙ্গ মুখ্যস্থান করে নিয়েছে বলেই আমরা এই দিকগুলিই আমাদের আলোচনার অর্ন্তভুক্ত করেছি।

এই কাজ করতে গিয়ে অর্থাৎ রবীন্দ্রনাথের জীবনভাবনার প্রেক্ষাপটে ঐসব প্রসঙ্গের স্বরূপ বিশ্লেষণ করতে গিয়ে আমরা রবীন্দ্র সৃষ্টির তিনটি জগতের আশ্রয় নিয়েছি। এগুলি যথাক্রমে কাব্য, গান ও নাটক। কাব্য যদিও তাঁর প্রতিভার কেন্দ্রীয় বাহন, তথাপি আমাদের ধারণা গান ও নাটক তার অনুসংগী অথবা সম্পূরক। যে কথা রবীন্দ্রনাথ কবিতায় বলেছেন সেই কথার প্রতিধ্বনি আছে তাঁর গান ও নাটকে। বাহ্যত কবিতা ও গান পরস্পরের যেমন নিকটবর্তী, তেমনি দূরবর্তী নাটকের থেকে। কারণ হাজার হোক নাটক দৃশ্যকাব্য হিসেবে অন্য কোটির শিল্প, যার উপাদান বস্তুধর্মিতা। এদিক থেকে কেন আমরা রবীন্দ্রনাথের নাটককে কাব্যে ও গানের সঙ্গে একসূত্রে গেঁথেছি, তার কৈফিয়ত হিসেবে বলতে পারি - রবীন্দ্রনাথের নাটকও প্রকারান্তরে, রূপান্তরে তাঁর কবিসত্তারই প্রকাশ। এডওয়ার্ড টমসন বলেছেন, রবীন্দ্রনাথের নাটক তাঁর চিন্তার বাহন।[৩২] অর্থাৎ নাটকের ভেতর দিয়ে রবীন্দ্র নাথ একইভাবে তাঁর চিন্তা ও উপলব্ধিকে প্রকাশ করেছেন, যেমন করেছেন কবিতায় ও

৩২, Edward Thompson/Rabindra ath Tagore. Poet and Dramatist/ Rddhi-India/1926/Rabindranath Tagore : Poet and Dramatist

গানে। সর্বোপরি, রবীন্দ্রনাথের নাটকের কাঠামো নাটকের হলেও তার প্রকৃতি কাব্যিক। তা সে বিসর্জনই হোক, ডাকঘর অথবা রক্তকরবীর মতো নাটকই হোক। এই সব কারণেই কাব্য ও গানের পাশাপাশি নাটককেও গ্রহণ করেছি, তাতে আমাদের বক্তব্য ও উপস্থাপনা সমৃদ্ধি হয়ে উঠবে। এই আমাদের স্থির বিশ্বাস।

প্রসঙ্গত বলা দরকার, রবীন্দ্রনাথ সম্পর্কে ইতিমধ্যে অসংখ্য না হোক অনেক গবেষণা মূলক কাজ হয়েছে। গবেষণার বাইরেও অনেক আলোচনা করা হয়েছে রবীন্দ্র সাহিত্য সম্পর্কে। কিন্তু আমাদের গবেষণার শিরোণাম বা তার আলোচ্য বিষয় যে ঐসব গতানুগতিক আলোচনার অনুসারী নয়, তা এই প্রস্তাবনা থেকেই বোঝা যাবে। রবীন্দ্র নাথকে ও তাঁর সৃষ্টিকে খন্ডিত ভাবে না দেখে আমরা তাঁর সত্তার অর্ন্তনিহিতসত্যের অখন্ড রূপটি তুলে ধরতে চাই এবং তাঁর ভেতর দিয়ে তাঁর সত্তা ও সৃষ্টি কিভাবে অন্যোন্য হয়ে বাঙ্ময় রূপ নিয়েছে তার স্বরূপ উদ্‌ঘাটন করাই বর্তমান গবেষণার অন্বিষ্ঠ।

সবশেষে বলি, 'জীবন-ভাবনা' শব্দটি হয়তো একটি প্রচলিত শব্দ। কিন্তু শব্দটিকে একটি প্রত্যয় হিসেবে এখানে ব্যবহার করা হয়েছে। এদিক থেকে 'রবীন্দ্রনাথের জীবনভাবনা' নামকরণ হয়তো বা নতুন একটি ইঙ্গিত বহন করছে গবেষণার বিষয় হিসেবে। অলমিতি।

উল্লেখপঞ্জী

১. রবীন্দ্ররচনাবলী / জন্মশতবার্ষিক সংস্করণ

২. Rabindranath Tagore poet and Dramatis/Edward Thompson.

৩. Plato on poetics.

৪. Defence of poetry

৫. পিতৃস্মৃতি /রথীন্দ্রনাথ ঠাকুর

৬. রবীন্দ্রনাথ/ অজিত চক্রবর্তী

৭. জয়ন্তী উৎসর্গ/ রবীন্দ্র পরিচয় সভা

৮. রবীন্দ্রনাথ /নলিনীকান্ত গুপ্ত

৯. রবি-দীপিতা/ সুরেন্দ্রনাথ দাশগুপ্ত

১০. Robindranath Tagore/Mary M Hago

১১. Tagore's Quest / Abu Sayeed Ayyub.

১২. রবীন্দ্রসরণি /প্রমথনাথ বিশী

১৩. রবীন্দ্রনাথের বিশ্বাসের জগৎ/ সত্যেন্দ্রনাথ রায়

১৪. Philosophy of Tagore/S.Radhakrishnan.

১৫. The Visra Bharati Quarterly/Ed. Hirendranath Datta/Tagore Centenary Number.